ডেভিস কাপে ভারতের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডই ফেভারিট

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ পনেরো টাকা

আনন্দমেলা

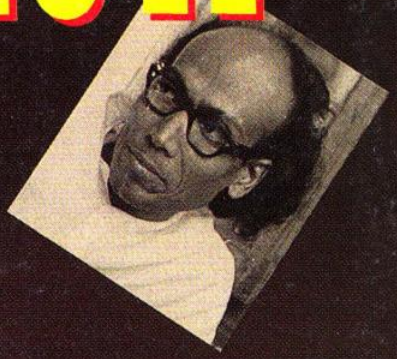

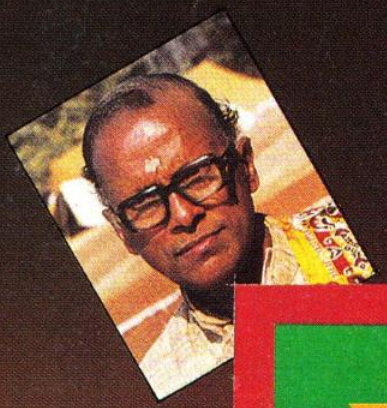

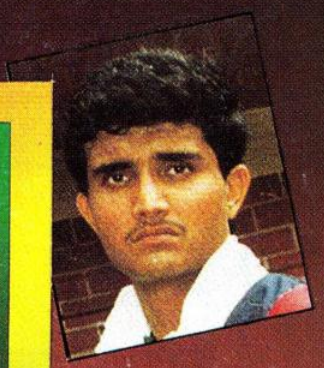

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

সব মানুষের জীবনেই আছে এমন অভিজ্ঞতা, যা ভোলা যায় না। এরকমই কিছু অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, সুবিনয় রায়, শঙ্খ ঘোষ, গণেশ পাইন, অমলাশঙ্কর, নিমাইসাধন বসু, ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম বর্মন, দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশ দত্ত, শানু লাহিড়ী, নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিব্যেন্দু বড়ুয়া, লিয়েন্ডার পেজ এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

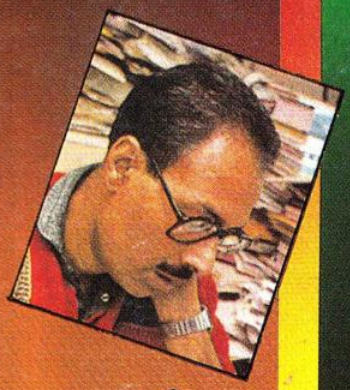

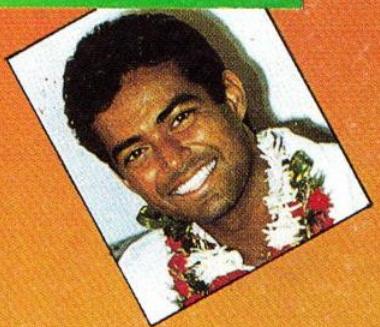

"এ তো মহা জ্বালা, জন্মভূমি দেখব না খাবার গরম করব ?"

কি আবার করবেন, জন্মভূমিই দেখবেন।

আর খাবার ?

রান্না যদি হয়ে গিয়ে থাকে সেলো হট্ পট্টে রেখে দিন। গরম থাকবে সাত ঘন্টা অবধি।

বাবা ! তাহলে তো বেঁচে যাই। রোজ রাঁধা অবধি পোষায়,তার উপর আবার বার বার গরম করা।

সেলোর হাতে ছেড়ে দিন না, খোদ জার্মান জিনিস।

দেখুন ঠিক বলছেন তো। আমার কর্তা কিন্তু খেতে বসে ঠান্ডা খাবার দেখলে ভীষণ চেঁচাবে।

শুধু সেলোতে আছে বিশেষ ধরনের জার্মান 'ইনসুলেশন,

তাই খাবার গরম থাকবে ঘন্টার পর ঘন্টা।

দেখেছেন ! আপনার সাথে কথা বলতে বলতে জন্মভূমি শুরু হয়ে গেল।

সেলো স্ট্যাকেবল

সেলো শেফ

সেলো হট ম্যাক্স

cello

HOTPOT

Better by Degrees

গরম খানা ফটাফট

৫০০ মিলি থেকে ১০ লিটার - সব সাইজে পাওয়া যাচ্ছে।

Situations/CT/9/98

আনন্দমেলা

২৪ বর্ষ ১২ সংখ্যা ৬ আশ্বিন ১৪০৫ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

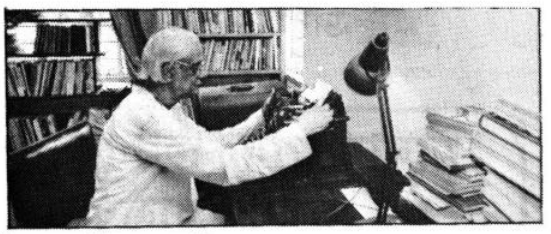

১১ স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

প্রত্যেকের জীবনেই থাকে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা। বিখ্যাত মানুষদের জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার যেমন বিপুল, তেমনই বিচিত্র। কেমন সেসব অভিজ্ঞতা? জানিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, শঙ্খ ঘোষ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কবি ও সাহিত্যিক, গণেশ পাইন ও শানু লাহিড়ীর মতো চিত্রকররা। আছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, লিয়েন্ডার পেজ, দিব্যেন্দু বড়ুয়া। এ ছাড়াও বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুবিনয় রায়, প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য নিমাইসাধন বসু, চিত্রপরিচালক নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ভারতের প্রথম মহিলা বৈমানিক দুর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা পুরসভার কমিশনার অসীম বর্মন, নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্কর ও মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত।

৬২ কথাকলির দেশে

কেরল। কথাকলি নাচ, নৌকো বাইচ আর নারকেল গাছে ভরা বেলাভূমির দেশ। আরব সাগরের নীল জল আর কুচিপুড়ি গ্রামের নাচের ঐতিহ্য পর্যটকদের টানবেই। কীভাবে যেতে হবে, কোথায় থাকবেন, জানাচ্ছেন তাপস রায়।

৬৪ ডেভিস কাপ

ভারতের সামনে এবার ডেভিস কাপের ওয়ার্ল্ড গ্রুপে টিকে থাকার লড়াই। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্লে অফ ম্যাচে ভারতের সম্ভাবনা কতটা? লিয়েন্ডার-মহেশ কি পারবেন টিম হেনম্যান ও গ্রেগ রুসেদস্কিকে হারাতে? আলোচনা করেছেন প্রতাপ জানা।

আগামী আকর্ষণ

বিশেষ বিজ্ঞান সংখ্যা

আধুনিক বিজ্ঞানের নানা দিক, বিভিন্ন গবেষণা নিয়ে আনন্দমেলার 'বিশেষ বিজ্ঞান সংখ্যা'। 'ইন্টারনেট' থেকে 'অ্যানড্রয়েড', মহাকাশবিজ্ঞান থেকে রোবট নিয়ে গবেষণা —বিজ্ঞানের একেবারে আজকের আবিষ্কারগুলির এক আশ্চর্য সমাহার।

এ ছা ড়া ও

প্র চ্ছ দ কা হি নী

জীবনে কখনও আমেরিকা...অন্নদাশঙ্কর রায় ১১
বড় হয়েছি ঠাকুমার মুখে...গণেশ পাইন ১২
বর্ষামঙ্গলের রিহার্সালে... সুবিনয় রায় ১৪
রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে...শঙ্খ ঘোষ ১৫
রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের...নিমাইসাধন বসু ১৬
বিমান নামাতে কয়েক মিনিট...দুর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭
জাহানারার মতো সত্যিকারের...অসীম বর্মন ১৮
অন্তহীন সমুদ্রে সেদিন...অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ২২
বাংলা ধমকেই কাজ হল...যোগেশ দত্ত ২৬
ওলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ই...লিয়েন্ডার পেজ ২৭
লর্ডসের ওই সেঞ্চুরি...সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৩০
শব্দদূষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর...
ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭
ব্যাগে ভালুকছানা নিয়ে...শানু লাহিড়ী ৫৮
ছোট্ট সেই কুকুরছানাটার কথা...নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় ৫৯
বাঘটাকে মারা যায়নি, তাই...শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৬০
বেলজিয়ামের প্রথম অনুষ্ঠানের স্মৃতি...অমলাশঙ্কর ৬৭
টিউব রেলের গোলমালে...দিব্যেন্দু বড়ুয়া ৬৮

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

মা, আমার মা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৮
ভাঙা ডানার পাখি সুচিত্রা ভট্টাচার্য ৪২

ধা রা বা হি ক র চ না

লর্ডস থেকে ঢাকা সব্যসাচী সরকার ৩৪

বি শে ষ প্র তি বে দ ন

সত্যি টাইটানিক মধুজিৎ মুখোপাধ্যায় ৫
স ম্পূ র্ণ উ প ন্যা স (প্র থ মা ং শ)
বিশ্বাসঘাতক দুধনাথ সুপ্রিয় ঠাকুর ৪৬

নি য় মি ত ক মি ক্স

আর্চি ২১ টিনটিন : আশ্চর্য উল্কা ২৪ ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য ২৮ ব্রিটেনে অ্যাসটেরিক্স ৩২ অরণ্যদেব ৩৬ টারজান ৪০ গাবলু ৪৪

নি য় মি ত বি ভা গ

কুইজ ৭০ শব্দসন্ধান ৪৫ কবিতা ১০

প্র চ্ছ দ

সুবীন দাস

স ম্পা দ ক

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

এবিপি লিঃ-এর পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১৫ টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা, উত্তর-পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত নতুন ডায়মণ্ড কমিকস

ভারতবর্ষে সর্বাধিক বিক্রীত কমিকস
ডায়মণ্ড কমিকসের
নিবেদন

মনোরঞ্জনে ভরপুর এক সম্পূর্ণ পত্রিকা

কমিক ওয়ার্ল্ড

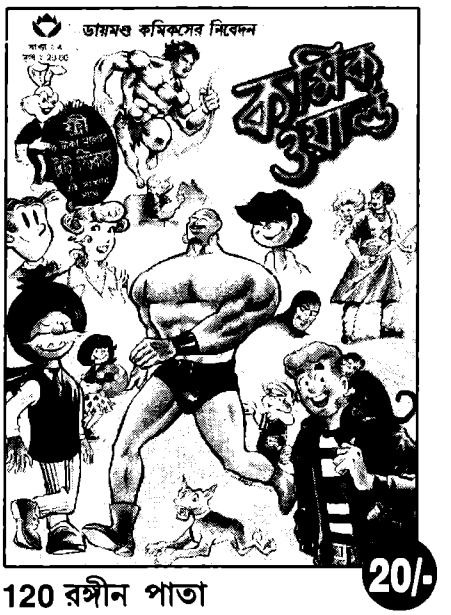

120 রঙীন পাতা

যার পাতায়-পাতায় ভরপুর মজা আর মনোরঞ্জন! বিশ্বের প্রায় প্রতিটি কমিকস চরিত্র **ফ্যান্টম, ম্যানড্রেক, ব্যাটম্যান, ফ্ল্যাশ গর্ডন, মডেস্টি ব্লেইজ, টম আর জেরী, আর্চি, গারফীল্ড** এবং আরও অনেক চরিত্র এবং তাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের নিজস্ব ভারতীয় চরিত্র **চাচা চৌধুরী, বিল্লু, পিঙ্কী** ইত্যাদি-ইত্যাদি এবং অমর চিত্র কথা-র অন্তর্গত গণেশ, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ইত্যাদি! এ ছাড়াও রয়েছে জ্ঞানবর্ধক পাতা, বিশ্বের মজার-মজার খবর, গাড়ী, খেলাধূলো, ফিল্ম, বিজ্ঞান, অদ্ভূত রেকর্ডস, পত্র-মিতালী এবং বেশ কিছু প্রতিযোগীতা এবং ধাঁধা!

ডায়মণ্ড কমিকস (প্রাঃ) লিমিটেড এ-11, সেক্টর 58, নয়ডা-201301 (উ.প্র.)

১৯১২-র বিপর্যয়ের চাঞ্চল্যকর কাহিনী

সত্যি টাইটানিক

অতলান্তিক মহাসমুদ্রে হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবে যায় বিলাসবহুল টাইটানিক। সরেজমিনে অজানা নানা তথ্য সংগ্রহ করে সাউদাম্পটন থেকে ওই ঘটনার কথা লিখেছেন বিশিষ্ট সমুদ্রবিজ্ঞানী মধুজিৎ মুখোপাধ্যায়।

তিন

জাহাজ ছাড়ার সময় রেলিংয়ে ঝুঁকে যাত্রীরা আত্মীয়-পরিজন-বন্ধুবান্ধবকে বিদায় জানাতে থাকেন। কয়লা ধর্মঘটের ফলে বহু জাহাজ ডকের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকায় টাইটানিকের গতিপথে বাধার সৃষ্টি হয়। টাইটানিকের মতো বড় জাহাজ চলার জন্য জলের যে গভীরতা দরকার, অন্য জাহাজ গভীর চ্যানেলের কাছাকাছি থাকায় তা পাওয়া যাচ্ছিল না।

এভাবে প্রথমেই ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। 'নিউ ইয়র্ক' জাহাজের নোঙর ছিঁড়ে যায় টাইটানিকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে। দুটো জাহাজের খোলের ধাক্কা লাগা কোনওরকমে এড়ানো হয়। টাইটানিককে থামিয়ে দেওয়া হয়, 'নিউ ইয়র্ক'কে সরিয়ে মাঝদরিয়ায় নিয়ে আসা হয়। এক ঘণ্টা থেমে থেকে টাইটানিক আবার তার যাত্রা শুরু করে। খুব শুভ আরম্ভ হল না। এর পর ইংলিশ চ্যানেলে পৌঁছে টাইটানিক রওনা হল চেরবুর্গের দিকে। যাত্রার এই পর্বে যাত্রী ও জাহাজকর্মীরা জাহাজের মধ্যে নিজেদের মানিয়ে নিতে ব্যস্ত রইলেন। পরের সাতদিন যে রুটিন তাঁরা মেনে চলবেন, তা শুরু হয়ে গেল। যাত্রার এই পর্বে বলার মতো ঘটনা কিছু ঘটল না।

১০ এপ্রিল ১৯১২, বুধবার। যাত্রীদের আসার আগে সকাল থেকেই সাউদাম্পটন ডকের চারদিকে ভিড়

লঞ্চিং-এর আগে, কাজ চলছে টাইটানিকের পেছনের অংশে

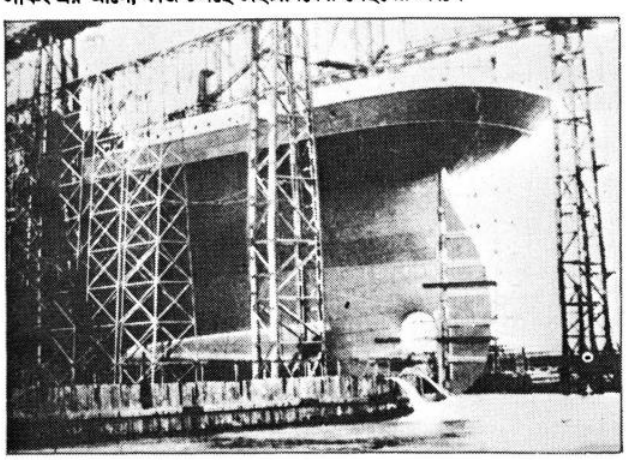

তৈরি হচ্ছে টাইটানিকের সামনের অংশ

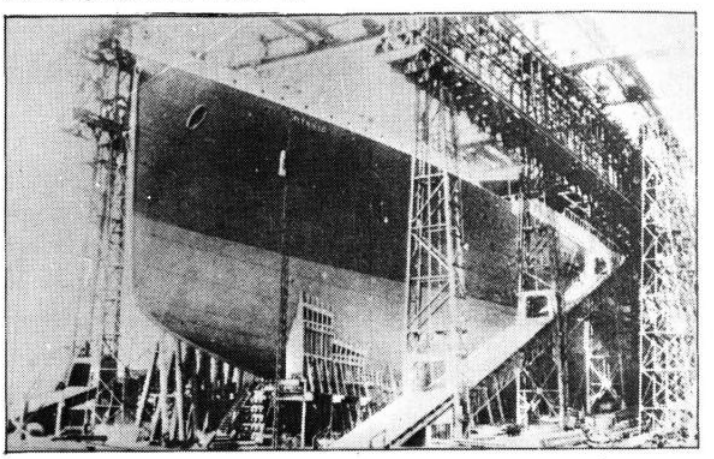

কুইন্সটাউনে টাইটানিকে চড়ার জন্য যাত্রীদের উদ্‌গ্রীব অপেক্ষা

হতে শুরু হয়েছে। পরিবেশে উৎসবের ছোঁয়া। ৮ এপ্রিল অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে 'অ্যাশেজ' জিতে এম সি সি ক্রিকেট দল দেশে ফিরে এসেছে। জাতীয় গর্ব একেবারে তুঙ্গে। সকলেই সেদিন 'ঐশ্বর্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসে ভরা ভাসমান শহরের' জন্য গর্বিত। শহরের মহিলাদের মুখে তৃপ্তি ও গর্বের ছোঁয়া। তাঁদের অনেকেরই বাবা-স্বামী-ভাই-সন্তানদের কেউ না কেউ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজে কাজ পেয়েছেন। জাহাজে বিলাসের ব্যবস্থা নিয়ে গুজবেরও শেষ নেই। যাত্রা শুরুর শুভেচ্ছা জানানো ও আনন্দ প্রকাশের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন অগণিত জনতা। সুবিধেজনক জায়গায় দাঁড়িয়ে টাইটানিকের যাত্রারম্ভ দেখতে, নতুন ইতিহাস রচনার সাক্ষী হয়ে থাকতে কে না চায়!

ক্যাপ্টেন স্মিথের আদেশে ঠিক দুপুর ১২টায় জাহাজের বাঁশি বেজে উঠল। তিনবার। জাহাজের সামনের দিক থেকে প্রধান অফিসার ওয়াইল্ড ও দ্বিতীয় অফিসার লাইটোলার জানিয়ে দিলেন, সবকিছু ঠিক আছে। জাহাজের পেছনের অংশ থেকে প্রথম অফিসার মার্ডক জানালেন, একই কথা। জাহাজের 'ব্রিজ'-এ ক্যাপ্টেন স্মিথের কাছে এই রিপোর্ট পৌঁছনোর সঙ্গে-সঙ্গে তিনি জাহাজের বাঁধন খুলে দেওয়ার আদেশ দিলেন। এবার শুভ যাত্রারম্ভ।

ডক থেকে টাইটানিককে বের করে আনতে পাঁচটা টাগের সাহায্য নিতে হয়েছিল। এই টাগগুলোই টাইটানিককে সাউদাম্পটন ডকে নিয়ে এসেছিল। জাহাজের ডেকে তখন বাজতে শুরু হয়েছে আনন্দের বাজনা। লিভারপুলের এক সঙ্গীত সংস্থা থেকে আটজন বাজনাদার ভাড়া করে আনা হয়েছিল জাহাজের বিভিন্ন রেস্তঁরাতে বাজনা বাজানোর জন্য।

ফ্রান্সের উত্তরপ্রান্তের বন্দর চেরবুর্গ। তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য অতলান্তিক পারাপারের জাহাজগুলোর পক্ষে এ-বন্দরে থামাটা ছিল জরুরি এবং সুবিধেজনক। শুরুতেই দেরি হওয়ার ফলে চেরবুর্গে পৌঁছনো গেল না ঠিক সময়ে। এখানকার যাত্রীরা ধৈর্য ধরে ছ'টা অবধি অপেক্ষা করলেন। চেরবুর্গে বিভিন্ন ধরনের ২৭৪ জন যাত্রী ওঠেন এবং ১৭ জন নেমে যায়। এখান থেকে ওঠা ১৪২ জন প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর মধ্যে ছিলেন বি-ডেকে সুইটের অধিকারী মিসেস শার্লট ড্রেক কারভেসা, তাঁর ছেলে, পরিচারিকা ও প্রচুর জিনিসপত্র। সার কসমো ও লেডি ডাফ গর্ডন এই বন্দর থেকে টাইটানিকে ওঠেন নিজেদের নাম ভাঁড়িয়ে এবং তাঁদের সেক্রেটারিকে নিয়ে। নাম ভাঁড়ানোর প্রয়োজন হয়েছিল কেন, আজও তা রহস্যে ঢাকা। এখানকার অন্য যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন বেঞ্জামিন গুনেহাইম, বংশ পরম্পরায় খনি, ধাতু ও যন্ত্রপাতির ব্যবসায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। ৩০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত সামুদ্রিক শিল্পী স্যামুয়েল ওয়ার্ড স্টান্টন। এই শ্রেণীতে ব্যারন অ্যালফ্রেড ফল ড্রাকস্টেড নামে এক যাত্রী ওঠেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর থাকার ব্যবস্থায় তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হন এবং বেশি ভাড়া দিয়ে তিনি প্রথম শ্রেণীতে চলে যান। তিনি অবশ্য বেঁচে গিয়েছিলেন। পরে জানা যায়, তিনি কোনও 'ব্যারন' নন, শুধুই অ্যালফ্রেড নুরনে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা ছিলেন মূলত পূর্ব ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের লোক।

চেরবুর্গে টাইটানিক দেড় ঘন্টা দাঁড়িয়েছিল। তারপর যখন আবার চলতে শুরু করল তখন দিনের আলো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। জাহাজের আলোগুলো জ্বলে উঠতে সে হয়ে উঠল আরও মোহময়, সে দৃশ্য স্থানীয় মানুষেরা জাহাজডুবির বহু বছর পরেও মনে রেখেছিলেন। জাহাজ এগিয়ে চলল পশ্চিমদিকে। যাত্রীর সব খাওয়াদাওয়া শেষ করে জাহাজে প্রথম রাতের ঘুমের জন্য তৈরি হচ্ছেন।

টাইটানিক সেন্ট জর্জেস চ্যানেল পার হয়ে হাজির হল আয়ারল্যান্ডের দক্ষিণে কুইন্সটাউনে (বর্তমান নাম কোভ)। রাত তখন সাড়ে এগারোটা। ১২০ জন যাত্রী ওঠেন। তাঁদের মধ্যে সাতজন বাদে সবাই তৃতীয় শ্রেণীর এবং বাদবাকি দ্বিতীয় শ্রেণীর। সাতজন

কয়লা ধর্মঘটের ফলে বহু জাহাজ ডকের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকায় টাইটানিকের গতিপথে বাধার সৃষ্টি হয়। টাইটানিকের মতো বড় জাহাজ চলার জন্য জলের যে গভীরতা দরকার, অন্য জাহাজ গভীর চ্যানেলের কাছাকাছি থাকায় তা পাওয়া যাচ্ছিল না।

এখানে নেমে যান। এঁদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষানবিশ পাদ্রি ফ্রান্সেস ব্রাউন। তাঁর তোলা টাইটানিকে বিভিন্ন অংশের ছবি আজ দুর্মূল্য। তিনি ছিলেন একজন শখের ফোটোগ্রাফার। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলেন বলে ওই এলাকার প্রচুর ছবি তিনি তুলেছিলেন। ১৩৮৫ বস্তা চিঠিপত্র এখান থেকে জাহাজে ওঠে।

জন কফে নামে এক জাহাজকর্মী এখানে জাহাজ থেকে জলে লাফ দিয়ে পড়ে পালিয়ে যান। তিনি তাঁর ঠিকানা দিয়েছিলেন কুইন্সটাউন। মনে হয় তিনি টাইটানিকে উঠে বিনা পয়সায় দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগটাই নিয়েছিলেন। ভাগ্যিস পালিয়েছিলেন। না হলে হয়তো মৃতের তালিকায় তাঁর নামও থাকত।

বছরের এই সময়ে আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত মনোরম। আকাশ একেবারে পরিষ্কার, হালকা বাতাস বইছে, আর সমুদ্র একেবারে শান্ত। নিউ ইয়র্ক বন্দরের উদ্দেশে পাড়ি দিল টাইটানিক। যাত্রীরা খুশি। তাঁরা জাহাজের নানা জায়গায় মহানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রাতরাশের সময় সকাল সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে দশটা। মধ্যাহ্নভোজ বেলা একটা থেকে আড়াইটে এবং সান্ধ্যভোজ সন্ধে ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটা। বিউগ্‌ল বাজিয়ে জাহাজে খাওয়ার সময় জানানো হত। প্রথম শ্রেণীতে ৫৩২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৩৯৪ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৪৭৩ জন একসঙ্গে বসে খেতে পারতেন। জাহাজে পুরো যাত্রী থাকলে দুটো ব্যাচে সবাইকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হত। কিন্তু যাত্রী সংখ্যা অর্ধেক থাকায় একবারেই সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল। ক্যাপ্টেন স্মিথ রোজ সকাল দশটায় ইউনিফর্ম ও মেডেল পরে জাহাজের সমস্ত বিভাগের প্রধানদের নিয়ে মিটিং করতেন। তারপর সকাল সাড়ে দশটায় জাহাজের সব জায়গার ব্যবস্থা দেখতে বেরিয়ে পড়তেন। এর মধ্যে ছিল তিনটি শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যবস্থা, খাবার ঘর, হাসপাতাল, কর্মশালা এবং ভাঁড়ার। জাহাজের চিফ এঞ্জিনিয়ারের থেকে জাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির খবরাখবরও নিতেন তিনি। তারপর জাহাজের ব্রিজে অফিসারদের ডেকে নানারকমের নির্দেশ দিতেন। ওয়্যারলেসের বিভিন্ন খবরাখবর ক্যাপ্টেন এখানেই পেতেন। এসব খবরের মধ্যে থাকত অন্য জাহাজ থেকে পাওয়া অভিনন্দন ও শুভেচ্ছাবার্তা।

জাহাজ ভালই চলতে লাগল। একভাবে ২১.৫ নট গতি বজায় রেখে সে শুক্রবার সকালের মধ্যে ৩৮৬ মাইল পথ অতিক্রম করে। (ক্রমশ)

হিমশৈল নিয়ে সতর্কবার্তা

মেসাবা নামে একটি জাহাজ থেকে ১৪ এপ্রিল সন্ধে সাতটা পঞ্চাশ মিনিটে টাইটানিকের কাছে হিমশৈল সম্পর্কে সতর্কবার্তা এসে পৌঁছয়। মেসাবা জানায়, প্রচুর হিমশৈল দেখা গেছে ৪১° ২৫′ – ৪২′ উত্তর অক্ষাংশে ও ৪৯° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে। এই সতর্কবার্তা কিন্তু টাইটানিকের ব্রিজে পাঠানো হয়নি। কারণ বার্তায় MSG-র (Master must Sign) বদলে ভুল করে লেখা ছিল MXG। এর কয়েক ঘন্টা পরে উল্লিখিত জায়গার কাছাকাছি টাইটানিকের সঙ্গে হিমশৈলের ধাক্কা লাগে। দুর্ঘটনাস্থলের সঠিক অবস্থান ৪১° ৪৬′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৫০° ১৪′ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ।

ডকে দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক সেই জাহাজ

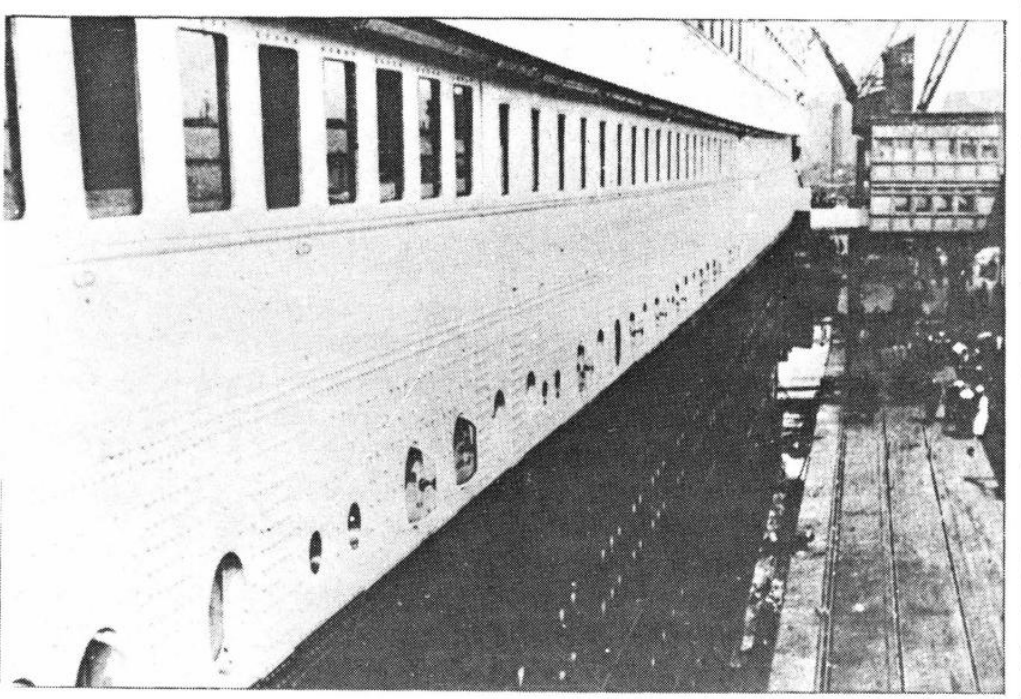

ক্যাপ্টেন স্মিথের আদেশে ঠিক দুপুর বারোটায় জাহাজের বাঁশি বেজে উঠল। তিনবার। জাহাজের সামনের দিক থেকে প্রধান অফিসার ওয়াইল্ড ও দ্বিতীয় অফিসার লাইটোলার জানিয়ে দিলেন, সবকিছু ঠিক আছে।

ধারাবাহিক উপন্যাস

মা আমার মা

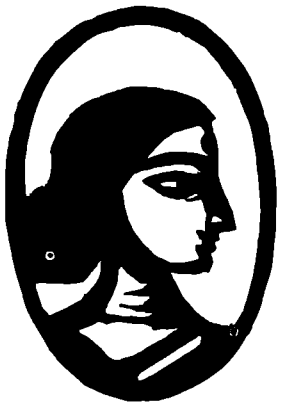

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

চোদ্দ

এক হাতে সেই ধারালো দা তুলে রেখে অট্টাবুড়ি আর এক হাতে পুলুকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল ঘরের কাছে। ভয়ে পুলুর সারা শরীর অসাড় হয়ে গেছে, সে অট্টাবুড়ির চোখ থেকে নিজের চোখ সরাতে পারছে না। বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েই যাবে।

তবু কোনওরকমে কাঁদো-কাঁদো গলায় সে বলল, "ও অট্টামা, আমায় ছেড়ে দাও! আর কোনওদিন করব না। অনেকদিন পরে বাবা এসেছে, বাবা ঝিঙের তরকারি খেতে চেয়েছিল... ঝিঙে চাই না, আমি ক্ষমা চাইছি।"

অট্টাবুড়ি নাকিসুরে হি হি হি হি করে হেসে উঠে নাচতে শুরু করল। দা'টা ফেলে দিয়ে দু'হাতে তালি দিতে দিতে বলতে লাগল, "কী মজা, কী মজা! একটাকে আজ পেয়েছি। কুচি কুচি করে কেটে মাংস রান্না করে খাব!"

হাসতে-হাসতে অট্টাবুড়ি বসে পড়ল মাটিতে!

তারপর হাতছানি দিয়ে বলল, "আয়, আমার কাছে আয়!"

পুলু হাতজোড় করে বলল, "দয়া করো! এবারকার মতন দয়া করো! আর কোনওদিন আসব না!"

বুড়ি এবার হাসি থামিয়ে বলল, "ওমা, সত্যি সত্যি ভয় পেলি নাকি? আমি তোকে নিয়ে একটু রঙ্গ করছিলাম, তা বুঝিসনি?"

পুলুর বিশ্বাস হল না অট্টাবুড়ির কথা।

বুড়ি বলল, "আমি তোর মাংস খাব? জীবনে কখনও মাছ-মাংস ছুঁয়ে দেখিনি। ওরে, আমার তিন কুলে কেউ নেই। বেঁচে থাকতে আর ইচ্ছে করে না। কিন্তু যমেও যে আমাকে নেয় না! এখানে একলা একলা পড়ে থাকি, গ্রামে ঢুকলেই ছেলেরা আমাকে মারে।"

পুলু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি কোনওদিন মারিনি!"

বুড়ি একদৃষ্টিতে পুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আয়, আমার কাছে আয়, তোর কোনও ভয় নেই। নাচতে গিয়ে আমার কোমরে ফিক লেগে গেছে, উঠতে পারছি না। আয়—"

পুলু এক-পা দু'-পা করে অট্টাবুড়ির কাছে চলে এল।

বুড়ি বলল, "বোস, আমার সামনে বোস।"

পুলু বসে পড়ল। বুড়ি পুলুর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "আহা রে আমার সোনা, ভয়ে মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে! তুই এত বড় ছেলে, আমার মতন একটা বুড়িকে ভয় পাবি কেন? আমার কি কিছু ক্ষমতা আছে? আমি কোনওদিন কারুর ক্ষতি করিনি, তবু লোকে আমাকে ডাইনি বলে! আমার চেহারাটাই এরকম, তাতে আমি কী করি!"

পুলু কী বলবে ভেবে পেল না। ঝিঙের দরকার নেই। এখন কোনওরকমে এখান থেকে যেতে পারলেই হয়! মা আর লতু ঝিলের ধারে বসে আছে। পুলু ফিরতে দেরি করলে চিন্তা করবেন মা। বাবাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে আসা হয়েছে!

বুড়ি মুচকি হেসে বলল, "তোকে তো আমি দেখেই চিনেছি, তুই বিশুর ছেলে! সেবারে বন্যার জলে ডুবেই মরতাম, বিশু আমাকে কোলে করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। বিশু ঝিঙের তরকারি খেতে চেয়েছে, আমি দেব না? যা আছে, সব নিয়ে যা! বেগুন নে, লাউ নে! আমাকে একটু হাত ধরে তোল তো সোনা! উঠতে পারছি না।"

পুলু অট্টাবুড়িকে টেনে তুলল।

সে কোমরটা বেঁকিয়ে কয়েকবার 'উঃ মারে' বলল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল কোনওক্রমে। পট পট করে কয়েকটা ঝিঙে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, "বিশু এসেছে? অনেকদিন ছিল না বুঝি? ঠিকই তো। সে থাকলে নিশ্চয়ই আমার খবর নিতে আসত। চল, আমি যাব তোদের বাড়ি। বিশুকে একবার দেখে আসি। আমার বাগানের তরকারি সে খাবে, আমি দেখব। দেখে আমার বুক জুড়োবে!"

সর্বনাশ! পুলু বুঝতে পারল, সে দারুণ ভুল করে ফেলেছে। বাবার ফেরার কথা কাউকে জানানো নিষেধ ছিল। ভয়ের চোটে তার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। এখন এই বুড়ি তাদের বাড়ি গেলেই তার পেছনে-পেছনে অনেক ছেলেমেয়ে ছুটে আসবে। বড়রাও আসতে পারে।

সে আমতা আমতা করে বলল, "বাবা এসেছিল, মানে, এসে চলে গেছে, হয়তো পরে আবার আসবে। মানে ঠিক নেই!"

অট্টাবুড়ি সে কথায় কান না দিয়ে কিছু বেগুন তুলে নিল, একটা লাউয়ের বোঁটা কাটল, তারপর বলল, "চল রে সোনা! দেখিস যেন, গ্রামের ছেলেরা আমাকে না মারে।"

পুলু আরও দু-একটা কথা বলে অট্টাবুড়িকে আটকাবার চেষ্টা করল। সে পাত্তাই দিল না। জিনিসগুলো একটা পুঁটুলিতে বেঁধে, একটা লাঠি হাতে নিয়ে বলল, "চল!"

ঝিলের ধারে সেই জায়গাটায় পৌঁছতেই লতু ভয় পেয়ে মায়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল অট্টাবুড়িকে দেখে। মা চোখ দিয়ে বকুনি দিলেন পুলুকে, কেন সে বুড়িকে সঙ্গে এনেছে? কিন্তু পুলু কী

করবে?

অট্টাবুড়ি মাকে বলল, "ও বউ, আজ তোদের বাড়িতে আমাকে দুটি ভাত খেতে দিবি? কতকাল যে অন্যের হাতের রান্না খাইনি! রোজ রোজ কি নিজের জন্য রান্না করতে ভাল লাগে?"

তারপর লতুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আহা, মেয়ের মুখখানি কী সুন্দর! ভয় পাচ্ছিস কেন বাছা? আমার গায়ে কোনও শক্তি নেই। তুই একটা ঠেলা মারলেও আমি পড়ে যাব!"

মা বললেন, "এই লতু, সামনে আয়, ভয়ের কী আছে!"

অট্টাবুড়ি বলল, "আমার কপালটাই পোড়া! নিজের ছেলেমেয়ে হল না। ছোট ছেলেমেয়েদের আমি কত ভালবাসি, কিন্তু তারা আমাকে দেখলেই ভয় পায়। ঢিল মারে!"

লতু বলল, "তুমি রাত্তিরবেলা রাক্ষুসি হও না?"

অট্টাবুড়ি বলল, "শোনো মেয়ের কথা! জ্যান্ত মানুষ আবার রাক্ষুসি হতে পারে নাকি? ওরে, আমি এখনও মরিনি! মরার পর কী হব তা জানি না!"

পুলু ছোট বোনকে ধমক দিয়ে বলল, "এই, ওরকম বাজে কথা বলতে নেই!"

মা বললেন, "আপনি দু-একদিন পরে আসুন। আপনাকে রেঁধে খাওয়াব। আজ... মানে, কখন রান্না হবে ঠিক নেই।"

অট্টাবুড়ি বলল, "জানি, জানি, বিশু এসেছে, তোরা আমার কাছে লুকোতে চাইছিস। আমি একটিবার তাকে দেখতে চাই। কবে মরে যাব তার ঠিক নেই, ওকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে। আমাকে ভাত দিতে না চাস না দিবি, বিশুকে একবার দেখেই চলে আসব!"

মা বললেন, "অট্টামা, কোনও মানুষ মুখ ফুটে দুটি ভাত খেতে চাইলে তাকে কেউ কি না বলতে পারে? আমরা খেলে তুমিও খাবে। শুধু একটা কথা তোমায় মনে রাখতে হবে। আমার স্বামীর খুব বিপদ। তাঁকে পুলিশে খুঁজছে। তাঁকে লুকিয়ে থাকতে হয়। তুমি তাঁর কথা আর কারুকে বোলো না। ঘুণাক্ষরেও বোলো না!"

অট্টাবুড়ির কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। ফিসফিস করে বলল, "পুলিশে তাকে খুঁজছে, বলিস কী রে! কেন, সে কী করেছে? চুরি না ডাকাতি, না মানুষ খুন?"

মা করুণ গলায় বললেন, "আমার স্বামী সেরকম কিছু করতে পারেন, তুমি তা বিশ্বাস করতে পারো?"

অট্টাবুড়ি দু'দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না, না, না! বিশু অমন খারাপ কাজ করতে পারে, তা আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না! তবে তাকে পুলিশে ধরতে চায় কেন? বিশু সোনার টুকরো ছেলে—"

মা বললেন, "তিনি দেশের কাজ করেন, সেইজন্য!"

অট্টাবুড়ি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "দেশের কাজ? সেটা আবার কী রে?"

মা বললেন, "আমাদের দেশের মানুষের কত কষ্ট। কত মানুষ খেতে পায় না। কত মানুষের মাথা গোঁজার জায়গা নেই। আমার স্বামী আরও অনেকের সঙ্গে মিলে দেশের মানুষের কষ্ট ঘোচাবার চেষ্টা করছেন।"

অট্টাবুড়ি বলল, "এ তো ভাল কাজ। তার জন্য পুলিশ তাকে ধরবে কেন? পুলিশ ব্যাটাদের কি আক্কেল নেই গা? পুলিশগুলো কি দেশের মানুষ নয়?"

পুলু বলল, "অট্টামা, এ-দেশের রাজা এখন কে জানো?"

অট্টাবুড়ি বলল, "না তো! রাজাকে কখনও দেখিনি। আমার মতন হেঁজিপেঁজি বুড়ি রাজাকে দেখবে, এমন ভাগ্য করে কি জন্মেছি?"

পুলু বলল, "সাহেব দেখেছ কখনও?"

অট্টাবুড়ি বলল, "ওই যে ফ্যাটফেটে রং, মাথায় টুপি পরে, আর খ্যাট ম্যাট করে কী যে বলে বোঝাই যায় না, তারাই তো সাহেব। ছোটবেলা একবার তমলুকে গেসলাম, তখন দু'-একটা দেখেছি!"

পুলু বলল, "ওই সাহেবরাই এখন দেশের রাজা। তারা অনেক দূর থেকে জাহাজে চেপে এসেছে। তারা আমাদের ভাল চায় না। আমাদের কষ্ট দেয়। আর আমাদের দেশ থেকে সোনাদানা সব জাহাজে চাপিয়ে নিয়ে যায়!"

অট্টাবুড়ি বলল, "তবে তো ওই গোরাগুলো খুব পাজি! আমি তো ভেবেছিলাম ভালমানুষ বুঝি!"

পুলু বলল, "পুলিশগুলো ওই সাহেবদের চাকর। সাহেবরা যা হুকুম করে, এ-দেশের পুলিশ তাই-ই শোনে। সাহেবরা আমার বাবাকে ধরতে পারলে মেরে ফেলবে।"

অট্টাবুড়ি বলল, "ইস! মারা অত সহজ। আমাদের বিশুকে কেউ ধরতে এলে তার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব একেবারে!"

এত বিপদের মধ্যেও অট্টাবুড়ির কথা শুনে হেসে ফেললেন মা।

পুলু বলল, "অট্টামা, সাহেবদের কাছে বন্দুক-পিস্তল থাকে, আমরা কিছুই করতে পারব না!"

মা বললেন, "তা হলে এখন চলো। সে মানুষটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে খিদে-তেষ্টায় ছটফট করছে!"

ঝিলের ধার দিয়ে এসে, সরু রাস্তাটা পেরিয়ে ওরা চলে এল রাস্তায়। পুলু চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল। সেই লোকদুটিকে আর দেখা যাচ্ছে না।

বেলা অনেক হয়েছে। এই গরমের মধ্যে কেউ বিশেষ দুপুরে বেরোয় না। ছোট ছেলেমেয়ের দলও রাস্তায় নেই, তাই অট্টাবুড়িকে নিয়ে আসতে অসুবিধে হল না। শুধু দুটো কুকুর তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করতে করতে আসতে লাগল পেছন পেছন।

অন্যদিন অট্টাবুড়িকে দেখলেই ছেলেমেয়েরা চ্যাঁচামেচি করে, ঢিল ছোড়ে, তাই কুকুররাও যেন জানে, এই বুড়ির গ্রামে ঢোকা নিষেধ।

কবিতা

মা

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

দূর আকাশে রুপোর থালা, হাতছানি দেয়, ডাকে।
পিপুল-জারুল কৃষ্ণচূড়া জোছনা-গুঁড়ো মাখে,
একটি ছেলে অবাক হয়ে থাকে।

জোছনা-গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ে, গড়িয়ে পড়ে জলে।
জোনাক-ঝিঁঝি উড়ছে উড়ুক, ঘুম পাড়ানোর ছলে—
কে আর তাকে ভূতের গল্প বলে...

গল্প-বলার মানুষ এখন মিটমিটে এক তারা।
একটি ছেলে একলা-একা, ঘুমিয়ে আছে পাড়া,
গাছগাছালি গুল্মলতা চারা...

দূর আকাশে রুপোর থালা, হাতছানি দেয়, ডাকে।
উড়ছে পাতা স্মৃতির খাতা, পড়ছে মনে মাকে,
দুঃখ-কথা বলবে ছেলে কাকে ?

একলা-একা নির্জনে এই বাঁধ মানে না চোখে।
বইতে থাকে জলের ধারা, ফুঁপিয়ে কাঁদে শোকে,
ঘুমিয়ে আছে পাড়াপড়শি, লোকে।

ছবি : নির্মলেন্দু মণ্ডল

পুলু কুকুর দুটোকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু তারা কিছুতেই যাবে না।

বাড়ির কাছাকাছি এসে ওরা একটু বিপদে পড়ল। কুকুরের ডাক শুনে বেরিয়ে এলেন জ্যাঠামশাই। যথারীতি এক হাতে রয়েছে হুঁকো, আর এক হাতে লাঠি। পুলুদের সঙ্গে অট্টাবুড়িকে দেখে তাঁর ভুরু দুটো কপালে উঠে গেল।

এমনিতে জ্যাঠামশাইদের সঙ্গে কথা বন্ধ। তবু জ্যাঠামশাই এখন বললেন, "অ্যাই পুলু, ওই বুড়িটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?"

পুলু আড়ষ্ট গলায় বলল, "অট্টামা'র অসুখ। তাই মা আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসছে।"

জ্যাঠামশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "কী, ডাইনির আবার অসুখ! সব মিছে কথা। ও কারও মাথা চিবিয়ে খেতে এসেছে!"

অট্টাবুড়ি কাতর গলায় বলল, "না গো, কত্তা! আমি ডাইনি নই গো! আমার শরীরটা বড় খারাপ। ওদের বাড়িতে দুটি খেতে এসেছি!"

জ্যাঠামশাই বললেন, "খাওয়াচ্ছি তোকে! দূর হয়ে যা! শিগ্‌গির দূর হয়ে যা!"

পুলু বলল, "আপনাদের বাড়িতে তো যাচ্ছে না। আপনি নিষেধ করছেন কেন?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "চুপ, আমার মুখে মুখে কথা বলবি না। এ গাঁয়ে আমি ওকে ঢুকতে দেব না!"

অট্টাবুড়ি হাতজোড় করে বলল, "ওগো কত্তা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি! আমি কারুর কোনও ক্ষতি করি না। সে সাধ্যই আমার নেই।"

জ্যাঠামশাই এবার লাঠি উঁচিয়ে বলল, "মুখের কথায় যাবি না? পিটিয়ে ওকে গাঁ-ছাড়া করব! বিদেয় হ! বিদেয় হ!"

জ্যাঠামশাই লাঠি দিয়ে অট্টাবুড়িকে মেরেই বসতেন, এই সময় বিন্তিদিদি দৌড়ে এসে লাঠিটা চেপে ধরে বলল, "বাবা, কী করছ, কী করছ! মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুললে পাপ হয় জানো না?"

জ্যাঠামশাই বললেন, "মেয়েমানুষ? ও তো ডাইনি! ও গাঁয়ে ঢুকলেই কোনও না কোনও বাড়ির একটা বাচ্চা মারা যায়! ও বাচ্চাদের রক্ত চুষে খায়।"

বিন্তিদি বলল, "ওসব বাজে কথা! অট্টামা গ্রামে না ঢুকলে বুঝি কোনও বাড়ির বাচ্চা মরে না? বাবা, তুমি ঘরে চলো। পুলু, তোরা যা রে, আমি বাবাকে সামলাচ্ছি!"

জ্যাঠামশাই তবু রাগে গরগর করতে লাগলেন। একমাত্র বিন্তিদির কাছেই তিনি জব্দ।

পুলুরা তাড়াতাড়ি অন্য দরজা দিয়ে উঠোনে ঢুকে গেল।

মা ঘরের তালা খুলতেই বাবা ওপর থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে বললেন, "উফ, গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে, একটু জলও রেখে যাওনি! তারপর তোমরা আসছই না, আসছই না!"

অট্টাবুড়ি ঘরে ঢুকে বাবাকে একেবারে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, "ওরে বিশু, সোনা আমার, মানিক আমার, কতদিন পরে তোকে দেখে বুকটা জুড়িয়ে গেল রে! পোড়ারমুখো পুলিশরা তোকে কিছুই করতে পারবে না। আসুক না একবার!"

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বুড়ি, এর মধ্যে আবার তুমি এসে পড়লে? চতুর্দিকে এত ঝঞ্ঝাট! যাকগে, এসেছ যখন, থাকো!"

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

(ক্রমশ)

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

বিখ্যাত মানুষদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার যেমন বিপুল, তেমনই বিচিত্র। এরকমই বিচিত্র সব স্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন জীবনের নানা ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিতজনেরা।

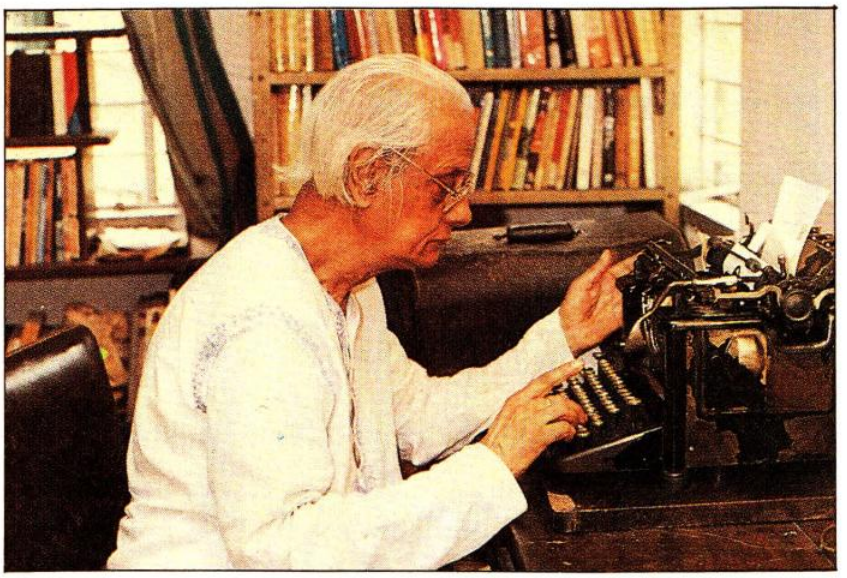

অন্নদাশঙ্কর রায়

জীবনে কখনও আমেরিকা যেতে পারিনি আমেরিকাই এসেছে আমার ঘরে

অন্নদাশঙ্কর রায়

ছেলেবেলায় আমার একটা নীল রঙের মলাটঅলা অ্যাটলাস ছিল। সেটা ছিল আমার দিনরাত্রের সঙ্গী। সবক'টা দেশ আমি চিনতে পারতুম। কোনটা কার রাজধানী, তাও জানতুম। প্রায়ই ভাবতুম, কোথায় যাব, কেমন করে যাব— দেশ-বিদেশ না দেখে আমার তৃপ্তি নেই। ভ্রমণকাহিনী যখন যা হাতে পাই তা-ই পড়ি, হোক না সেটা বাংলা বা ইংরেজি। এইসব পড়তে-পড়তে স্থির করে ফেলি আমি আমেরিকায় যাব। কারণ সেখানে একই সঙ্গে চলতে পারে 'আর্নিং অ্যান্ড লার্নিং'। অর্থ উপার্জন ও জ্ঞান উপার্জন। বাড়ি থেকে টাকা নিতে হবে না। কিন্তু সেখানে যাই কী করে? শুনলুম, অমুক-অমুক গিয়েছিল জাহাজের খালাসি হয়ে। আমিই বা কেন পারব না। জাহাজের খালাসি হয়ে সাগর পাড়ি দিতে? কিন্তু একটি ১৬-১৭ বছরের রোগা ছেলের পক্ষে সেটা কি সম্ভব? একদিন বেরিয়ে পড়লুম কলকাতায় বাবার কাছ থেকে ৩৫ টাকা নিয়ে। উদ্দেশ্য, সাংবাদিক হওয়া। তারপরে খালাসি হয়ে আমেরিকা যাওয়া। দুটো উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হল। ছোটকাকার অনুরোধে আমি কটক কলেজে ভর্তি হলুম। কটক কলেজ তখন পটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আই.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পেলুম ২৫ টাকা মাসিক বৃত্তি। তারপর গেলুম পটনা কলেজে। সেখানে ইংরেজি অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হলুম। প্রথম শ্রেণীর অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করে ৩০ টাকা মাসিক বৃত্তি পেলুম। সেই সময় পটনা কলেজে এম.এ. পড়তে-পড়তে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় যোগ দিয়ে প্রথমবারে হলুম পঞ্চম। সেবার মাত্র তিনজনকে নেওয়া হয়। দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় হলুম প্রথম। আমার দুয়ার খুলে গেল। তখন আমি শিক্ষানবিশ হয়ে সরকারি খরচে বিলেত যাত্রা করলুম। সেটা ১৯২৭ সাল। তখনকার দিনে মুম্বই থেকে 'পি অ্যান্ড ও' কোম্পানির লাইনার জাহাজ যেত আরব সাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্যসাগর, অতলান্তিক মহাসাগর দিয়ে লণ্ডনে। সময় লাগত তিন সপ্তাহ। তবে আমি,আমার বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার ও হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তিনজনে নেমে পড়লুম দু'সপ্তাহ পরে ফ্রান্সের মার্সেই বন্দরে। সেখান থেকে রেলপথে গেলুম ক্যালে। ক্যালে থেকে জাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পার হতে হল। ডোভারে পৌঁছে ট্রেনে চড়ে লন্ডন। মুম্বই থেকে লন্ডনযাত্রা আমার পূর্ব পরিকল্পিত নয়। তাই এটা একটা অপ্রত্যাশিত 'ভেঞ্চার'। তখন আমার ২৩ বছর বয়স। সেই অ্যাডভেঞ্চারই আমাকে নিয়ে আসে বাংলা সাহিত্যে। লিখি 'পথে প্রবাসে'। এই ভ্রমণকাহিনীটি আমাকে পরিচিত করে দেয় বাংলার সাহিত্যিকসমাজে। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর দুর্লভ সান্নিধ্য লাভ করি। বিলেত থেকে যখন ফিরে আসি তখন আমি একজন সিভিল সার্ভিস অফিসার। সেটা অন্য একটা জীবন। সাংবাদিকতা সেটা নয়। আমেরিকা যাওয়ার সাধ কিন্তু আমার অপূর্ণই থেকে যায়। কোনওদিন সেখানে যেতে পারিনি। তবে দেশে ফেরার এক বছরের মধ্যে একজন মার্কিন তরুণীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যায়। বলা যেতে পারে, আমি আমেরিকায় না গেলেও আমেরিকা আমার ঘরে এল। এটাই আমার জীবনের সেরা' অভিজ্ঞতা।

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

বড় হয়েছি ঠাকুমার মুখে রূপকথার গল্প শুনে

গণেশ পাইন

গণেশ পাইন

একেবারে ছেলেবেলা থেকেই ঠাকুমার কাছে মানুষ হয়েছি আমি। মধ্য কলকাতার কবিরাজ রো-র বাড়িতে। ঠাকুমাকে জড়িয়েই ছিল আমাদের মান, অভিমান, ভালবাসা। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর দোতলার কোণের ঘরে ঠাকুমার কাছে গল্প শুনতাম। রাক্ষস-খোক্কস, লালকমল-নীলকমল, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমির উপাখ্যান। ঘরের মধ্যে আলপিন পড়লেও বুঝি শব্দ হয়। এমনই চুপটি করে আমরা শুনতাম সেসব গল্প। একদিন মনে হল, এসব গল্পের ছবি এঁকে ফেললে কেমন হয়। খাটের নীচে স্লেট-পেন্সিল রেখেছিলাম। সেখানেই শুরু আমার প্রথম ছবি আঁকা।

তখন আমার কতই বা বয়স। চার-পাঁচ বছর হবে। অন্ধকারে রাক্ষস-খোক্কসের গল্প শুনতে-শুনতে কেমন গা ছমছম করত। রাত্রে গল্পের মধ্যেই কখন ঠাকুমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তাম তা নিজেও বুঝতে পারতাম না। এমনই করে বড় হয়ে উঠেছিলাম। ছেলেবেলা কেটেছে রূপকথার

"সকালের ভারী জলখাবার আবার দুপুরে খাওয়া, লুচি পায়েস, পটলের দোর্মা। পেট গুড়গুড় হবেনা কেন? পুদীনহরা না থাকলে যে কি করতাম?"

শ্রীমতী অনুরাধা বোস, গৃহবধূ। পুদীনহরা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে আমরা রোজই অনুরূপ প্রতিক্রিয়া জানতে পারছি।

শ্রীমতী বোসের বাড়ীতে আবার খাওয়া দাওয়ার বহর বড্ডো বেশী। তাই যখন ওনার ছেলেমেয়ে, কর্তা আর আত্মীয় বন্ধুরা পেটের গোলমালের কথা বলে, উনি একটুও অবাক হ'ন না। কারণ, শ্রীমতী বোস ভরসা করেন একমাত্র পুদীনহরা-তে।

পুদীনহরা : প্রকৃতির চিরসবুজ বরদান।

পুদীনহরাতে আছে মিণ্ট (পুদীনা) তেলের সংমিশ্রণ যা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত এবং অত্যন্ত কার্যকর। এটি পাচনতন্ত্রে স্থানীয়ভাবে কাজ করে ও ব্যথা কমিয়ে আরাম দেয়। তাছাড়া পুদীনহরায় আছে চমৎকার *এ্যাণ্টিস্প্যাসমোডিক (যন্ত্রণা উপশমকারী), কারমিনেটিভ (গ্যাস নিবারণকারী) এবং হজমশক্তির গুণ।*

পুদীনহরা : কার্যকরী অথচ কোনো সাইড এফেক্ট নেই।

সারা বিশ্বে এখন রাসায়নিক পদার্থের সাইড এফেক্ট নিয়ে গভীর উদ্বেগ বেড়ে চলেছে। সত্যি বলতে কি এর মধ্যে কিছু কিছু ওষুধ সম্প্রতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পুদীনহরা হ'ল এমন এক প্রাকৃতিক উপচার যার কোনো সাইড এফেক্ট নেই।

একবার পুদীনহরা ব্যবহার করুন। আপনি সর্বদা এতেই ভরসা করবেন।

যেমন করেছেন শ্রীমতী বোস এবং আরও লক্ষ লক্ষ পুদীনহরা ব্যবহারকারীগণ।

Pudin® Hara লিক্যুইড এবং পার্লস্

সঠিক এফেক্ট. নেই সাইড এফেক্ট.

Dabur

For more information on Pudin Hara, write in with your name, sex, date of birth, education, profession, address and phone no. to: Dabur Pudin Hara (AMH), P.O. Box 7326, New Delhi-110 065.

HTA 5723.98.BEN

স্বপ্ন দেখে-দেখে।

আমাদের ছিল জড়ানো সংসার। আমরা পাঁচ ভাই, মা, বাবা ছাড়াও আমাদের পরিবারে জড়িয়ে ছিলেন কাকা, কাকিমা ও খুড়তুতো ভাইয়েরা। ছেলেবেলায় মির্জাপুরের সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হই। সেখানে সত্যজিৎ রায়ের কাকা সুবিনয় রায় ইতিহাস পড়াতেন। নিজের একটা অদ্ভুত জগতে বাস করতেন তিনি। ছাত্রদের কাছে ছিলেন এক আকর্ষক ব্যক্তিত্ব।

আমার বাবা আমার ১০-১২ বছর বয়সেই মারা যান। তিনি বার্ড অ্যান্ড হিলজার্স কোম্পানির অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন। সেই দুঃসময়ে কাকারা আমাদের বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। যতই একটু-একটু করে বড় হয়ে উঠছিলাম বুঝতে পারছিলাম সংসারের আঁচ আমার গায়ে লাগছে। এইবার একটা কিছু করা দরকার।

সিটি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর ঠিক করলাম, নাঃ, অনেক হয়েছে, আর লেখাপড়া নয়। এবার একটা চাকরি করতেই হবে। চাকরির জন্য উঠেপড়ে লেগেছি, এমন সময় কাকা এসে বললেন, "গণেশ তুই এত ভাল ছবি আঁকিস, এখনই চাকরির চেষ্টা করছিস কেন? আর্ট কলেজে ভর্তি হলে তো পারিস?" আমি চৌরঙ্গির গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তির জন্য গেলাম। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন চিন্তামণি কর। পরীক্ষা দিলাম। কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে সেকেন্ড ইয়ারে ভর্তি করে নিলেন। তারপর মনপ্রাণ দিয়ে ক্লাস করেছি। পাশ করে আবার নতুন চিন্তা শুরু হল। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আর্থিক স্বাধীনতা চাই। তখনকার দিনে ছবি এঁকে রোজগারের সুযোগ ছিল খুবই কম ।

বলা হয়নি, আমি আর্ট কলেজ থেকে পেন্টিং-এ সেকেন্ড ক্লাস ও আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্‌টে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম। আমার বন্ধু ও সতীর্থদের মধ্যে শিল্পী হিসেবে নাম করেছে লালুপ্রসাদ সাউ, মুস্তাফা মানোয়ার, প্রকাশ দাস ও ফাল্গুনী দাশগুপ্ত।

চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও চাকরি পাচ্ছি না। বাড়িতে ছবি আঁকছি আর সন্ধেবেলায় কখনও কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কখনও চৌরঙ্গির নিউ ইয়র্ক সোডা ফাউন্টেন-এ বসে বন্ধুদের সঙ্গে আকাশপাতাল আলোচনায় মেতে উঠছি। একসময় কিছুদিন মন্দার মল্লিকের স্টুডিওতেও কাজ করেছি। কিন্তু মনের তৃপ্তি মেটেনি। নানা জায়গায় চাকরির ডাকও পাচ্ছি কিন্তু চাকরি হচ্ছে না। এই সময় একটি বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করি। কেশোরাম কটন মিল্‌সে শাড়ির পাড় ও আঁচল ডিজাইনের জন্য শিল্পীর প্রয়োজন। তাঁরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। কপাল ঠুকে চিঠি ছেড়ে দিই। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ইন্টারভিউয়ের চিঠি আসে। ইন্টারভিউয়ে পাশও করে যাই। তারপরের অভিজ্ঞতাই আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা অভিজ্ঞতা। হয়তো সে অভিজ্ঞতা না হলে আজকে আমি এইভাবে শিল্পী গণেশ পাইন হিসেবে প্রতিষ্ঠাই পেতাম না।

গণেশ পাইনের প্রথম জীবনে করা 'স্কেচ'

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ইন্টারভিউয়ের পর আমাকে বলা হল, তোমার কাজ খুব ভাল, তোমাকে ১০০ টাকা বেশি মাইনে দেওয়া হবে। আমি তো দারুণ খুশি। হঠাৎ খবর পেলাম, মিঃ ব্যাস নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি তো খুশি-খুশি মনে দেখা করতে গেলাম। মিঃ ব্যাস ছিলেন বিড়লাদের ঘনিষ্ঠ একজন প্রশাসক। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার কাজ সব দেখেছি। কেন আসতে চাইছ কেশোরাম কটনসে? এখানে কী করতে হবে জানো? খালি 'ট্রেসিং' আর একই ডিজাইন 'রিপিট'। তোমার এখানে আসার এত ইচ্ছে কেন?"

আমি বলি, "আমার নিজের পায়ে দাঁড়ানো দরকার। তাই আমি চাকরি করতে চাই, সার।"

মিঃ ব্যাস হেসে ওঠেন, "সে তো ভাল কথা। কিন্তু 'যামিনী রায়দের' জায়গা এটা নয়। তুমি এখানে এসো না। যাও, বাড়িতে গিয়ে কথা বলে আমাকে জানাও কী করবে।"

মনখারাপ করে বাড়ি চলে এলাম। বাড়ির সবাই পরামর্শ দিলেন, "হাতের লক্ষ্মী ছাড়তে নেই। তাই লেগে যা কাজে। দেখবি, সব ঠিক হয়ে যাবে।" তার একদিন পরেই আবার দেখা করতে যাওয়া। বাসে উঠেছি, হঠাৎ দেখি দুটি ছোট-ছোট মেয়েও ওই বাসে উঠল। তারা পাশাপাশি বসে। কিন্তু একটি মেয়ে তার জামার পকেটে কী যেন আড়াল করার চেষ্টা করছে। তাকিয়ে দেখি, একটা শিঙাড়া। বাড়ি গিয়ে ভাল করে খাওয়ার জন্য সে সযত্নে নিয়ে যাচ্ছে শিঙাড়াটি। হঠাৎ আমার চোখেও যেন দিব্যদৃষ্টি এল। মনে হল, আমারও তো লুকনো আছে একটি সম্পদ। আমার শিল্পীসত্তা। আমি তো ছবি আঁকতে পারি,প্রতিজ্ঞা করলাম, ছবি এঁকেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হব আমি।

কেশোরাম কটন্‌স-এ গিয়ে মিঃ ব্যাসকে বললাম, "না, আমি আপনাদের চাকরি নিচ্ছি না। আমি ছবি এঁকেই বড় হব।"

মিঃ ব্যাসের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। বললেন, "আমি বিশ্বাস করি, তুমি জীবনে একদিন খুব বড় হবে। ছবি আঁকার কাজটা চালিয়ে যাও।"

একটা অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। তারপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। আমার ছবি আঁকার সাফল্য আমাকে খ্যাতি দিয়েছে, অর্থ দিয়েছে, প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। পৃথিবীর যে-কোনও বড় শহরেই এখন আমার ছবির গুণগ্রাহী দর্শক আছেন। আমার একটা নিজস্ব আধ্যাত্মিক চেতনা আছে। তার জন্য আমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঋণী। খুব ছেলেবেলায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়েছিলাম। বুঝি বা না বুঝি, সেটা জীবনে রেখাপাত করেছিল। ছেলেবেলায় আমার দাদাকে পড়াতে আসতেন জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক। তিনি গভীরভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছে আমরা রামকৃষ্ণের জীবনদর্শন শুনে বড় হয়ে উঠেছি। আমার বয়স এখন ৬২ বছর। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শুধু একটা কথাই বলতে পারি, যে কাজে যার প্রীতি আছে যদি মন দিয়ে তা করা যায়, সার্থকতা আসবেই।

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

বর্ষামঙ্গলের রিহার্সালে প্রথম সুযোগ হয়েছিল গুরুদেবের কাছে গান শেখার

সুবিনয় রায়

এই ৭৬ বছর বয়সে পেছনের দিকে ফিরে তাকালে মনে পড়ে, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার দিনই না পেরিয়ে এসেছি। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা, গুরুদেবকে দেখা, তাঁর কাছে গান শেখার দুর্লভ সৌভাগ্য হওয়া।

সেটা ১৯৩৯ সালের ঘটনা। আমি তখন বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনের ছাত্র। আই. এস. সি. পড়তে গিয়েছিলাম ওখানে। সেই সময় কলেজের ছাত্র হিসেবেই আমাদের সঙ্গীত ভবনে গান শেখার সুযোগ ছিল। আমাদের সঙ্গেই পড়তেন সিনেমার অরুন্ধতী দেবী, সুদর্শনা রায় প্রমুখরা। তখন সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। তিনি আমায় খুব স্নেহ করতেন। আমার গানের নেশাকে উৎসাহিত করতেন।

একদিন বললেন, "তুমি তো ভালই গানটান করো। 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠান হবে। সেখানকার রিহার্সালে তুমি ঢুকে পড়ো। গুরুদেব নিজে গান শেখাবেন উত্তরায়ণে আর পুনশ্চয়।"

একটা গেরুয়া রঙের জোব্বা পরে প্রথম যেদিন এলেন রবীন্দ্রনাথ, আমি মোহিত হয়ে যাই। কী সুদর্শন চেহারা, কী সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব! বড়-বড় চোখ, দুধে আলতায় রং আর কী স্নিগ্ধ ব্যবহার! এক-একদিন গান লিখতেন আর নিজেই সুর করে শেখাতেন। এখনও মনে আছে, তিনি শিখিয়েছিলেন, মন যে কেমন করে হল দিশাহারা, সঘন গহন রাত্রি, ওগো সাঁওতালী ছেলে, আমি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে ইত্যাদি ১৬ টি গান।

আমাদের রিহার্সেলে থাকতেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেশ্বরী দত্ত, নীলিমা সেন, আব্দুল আহাদ ও শচীন দেব বর্মনের ভাইপো জ্যোতিষ দেব বর্মন। রাজেশ্বরী, কণিকা, আহাদ ও জ্যোতিষ গানের কোর্স শেষ করে গুরুদেবের হাতের সই করা অভিজ্ঞানপত্রও পেয়েছিল। 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানটি হল উত্তরায়ণের সামনে একটি প্রাঙ্গণে। চাঁদোয়া টাঙিয়ে। আমিও গাইলাম সকলের সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের গানকে উপলব্ধির এক অন্য স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন সুবিনয় রায়

গুরুদেব "ঝুলন" কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। 'পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণখেলা, নিশীথবেলা'—। গুরুদেবের নির্দেশে আবৃত্তির সঙ্গে দ্রুততালে মৃদঙ্গে দাদরা বাজালেন সঙ্গীতভবনের তালযন্ত্রের অধ্যাপক উমাপদ ধর। গুরুদেবের উপস্থিতি সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। এ স্মৃতি আমার ভোলবার নয়।

আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী সুধাময়ী দেবী ছিলেন আমার মাসিমা। খুব ছেলেবেলা থেকেই শান্তিনিকেতনে গেলে তিনি আমার হাত ধরে ঘুরে বেড়াতেন। একবার ৭ পৌষের মেলায় যাওয়ার পথে মাসিমা হুটোপাটি করে আমার হাত ধরে চলতে গিয়ে আচমকা সামনের গেস্ট হাউসের ড্রেনের মধ্যে পড়ে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে আমিও। তারপর কোনওরকমে উঠে আমি তো মাসিমাকে ভীষণ বকাবকি শুরু করি। মেসোমশাইয়ের কাছে গিয়ে বিরাট নালিশ। তারপর সে ঘটনা নিয়ে শান্তিনিকেতনে কী হাসাহাসি!

গুরুদেবকে দারুণ হাসতে দেখেছিলাম একবার। 'হাস্যকৌতুক'-এর একটা নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল তখন শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন স্টেজে ছিলেন শ্রোতা হিসেবে।

অরুন্ধতী দেবী অভিনয় করছিলেন। তাঁর অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথের সে কী হাসি! হাসির তোড়ে সমস্ত শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। দর্শকদের মধ্যে তখন ছিলেন অনিল চন্দ, বনফুলের ভাই অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, আমি এবং আরও অনেকে।

এখন মনে হয়, আমার সাংস্কৃতিক মনটি তৈরি হয়েছিল শান্তিনিকেতনেই। গুরুদেবের আশীর্বাদ পেয়েছি।

আর কর্মজীবনের সুযোগ ঘটে যায় বিলেতে লাইব্রেরিয়ানশিপ পড়তে গিয়ে। সেখানে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে তোমার?"

আমি বলি, "নিশ্চয়, কিন্তু চাকরি পাব কী করে?"

প্রশান্তবাবু বলেন, "আমার ইনস্টিটিউট তোমার জন্য দুয়ার খোলা রইল।"

দেশে ফিরে দেখি সত্যি-সত্যি অধ্যাপক তাঁর কথা রেখেছেন।

এসব আমার জীবনে অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ভোলা যায় না।

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে পরীক্ষা দিতে বসিয়েছিলেন মাস্টারমশাই

শঙ্খ ঘোষ

জীবনে তো কত কিছুই ঘটে। তার অনেকটাই ভুলে যায় লোকে, কিছুটা মনে থেকে যায়। মনে যা থেকে যায়, সে-ঘটনাগুলির যে বিরাট কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে তা নয়, তবু ব্যক্তিগত স্তরে তার একটা স্মরণীয়তা থাকে ব্যক্তিগত কারণেই। কোনও বিস্ময়, কোনও কৃতজ্ঞতা, কোনও লজ্জা, কোনও শ্রদ্ধা—এই সব হয়তো মিশে থাকে তার সঙ্গে। সে-রকম দু-একটা ঘটনার কথা বলি।

সালটা ইংরেজি ১৯৪২। বছরদশেক বয়স তখন আমার। সেই সময় একবার আমি জলে ডুবে যাচ্ছিলাম এবং একজন আমাকে বাঁচিয়েছিল। সেই কারণেই যে ঘটনাটা মনে পড়ছে তা নয়, ব্যাপারটা এমন যে তা ভোলা যায় না।

পুজোর সময় বরিশালের গ্রামের বাড়িতে গেছি। সারাদিন দলবেঁধে হুটোপাটি করছি। গায়ে কাদা মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। হুটোপাটি করতে করতে সন্ধে হয়ে এসেছে। এইবার বাড়ি ফিরতে হবে। তাই পুকুর ধারে হাত-পা ধুয়ে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ পা পিছলে জলে পড়ে যাই।

এদিকে সন্ধে হয়ে এল অথচ আমরা বাড়ি ফিরছি না দেখে বাড়ির অনেকেই আমাদের খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়েছেন। সেই সময় আমার ১৩ বছরের এক খড়তুতো দিদি অঞ্জলির চলছিল প্রায় একশো দুই-আড়াই জ্বর। সে-ও আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। আমি তো তখন জলের নীচে ডুবে যাচ্ছি। সবই কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। হঠাৎ কে যেন চুলের মুঠি ধরে আমাকে তুলে নিয়ে এল জল থেকে। আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে দেখি, সে আমার সেই দিদি। জলের মধ্যে হাতের নাগালে পেলে নিশ্চয় তাকে জাপটে ধরতাম। আর তা হলে দু'জনেই ডুবে মরতাম। চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে সে

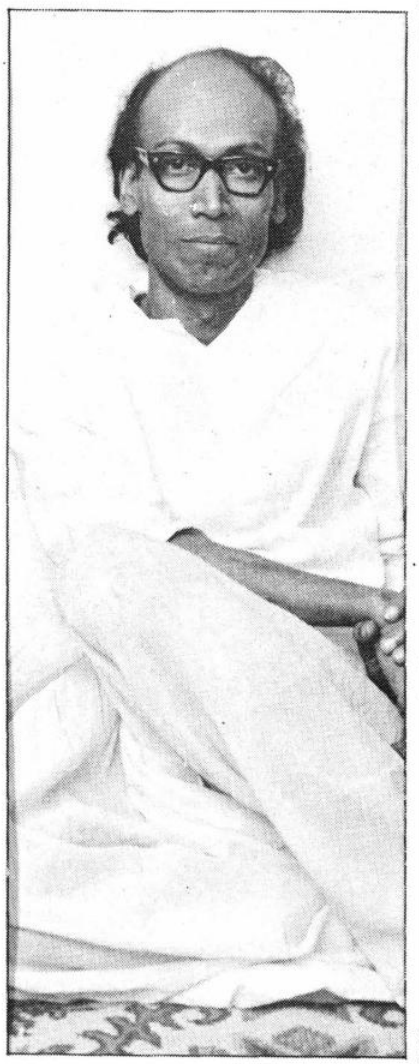

কবি শঙ্খ ঘোষ

বুদ্ধির কাজই করেছিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পর পাবনার পাকশিতে কাকার বাড়িতে গিয়ে সেই দিদির কাছেই আমাকে সাঁতার শিখতে হয়েছিল, তাদের বাড়ির কাছেই এক মস্ত পুকুরে। এখনও পেছন ফিরে তাকালে চোখের সামনে ভেসে ওঠে, একটা ছোট্ট মেয়ে কীভাবে তার জীবন উপেক্ষা করে ডুবন্ত ভাইকে বাঁচিয়ে তুলেছিল, তার ছবি।

আর একটি ঘটনা বলি। তখন আমার বয়স ১৪ বছর। সে ১৯৪৬ সালের কথা। কলকাতায় ১৬ অগস্টের বীভৎস দাঙ্গা হয়ে গেছে।

আমরা ছিলাম পাকশিতে। সেখানে অবশ্য বিশেষ কিছু হাঙ্গামা হয়নি। কিন্তু গোটা দেশ জুড়েই তখন যে আতঙ্ক, গুজব, অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে— ধীরে ধীরে পাকশিতেও সেই অনিশ্চয়তার আবহাওয়া তৈরি হতে লাগল। নানা গুজব, অসম্ভব উত্তেজনা।

আমরা থাকতাম মাস্টার-পাড়ায়, শহরের নিরিবিলি প্রান্ত অঞ্চলে। সামনে বিশাল মাঠ। মাঠ পেরিয়ে আর-এক অঞ্চলে রেলওয়ে অফিসারদের বসবাস। তাঁদের সুরক্ষিত বাংলো-বাড়ি।

একদিন রাত দশটা-সাড়ে দশটায় কয়েকজন মাস্টারমশাই এলেন বাড়িতে।

মাস্টারমশাইদের মধ্যে উত্তেজিত আলোচনা শুনতে পেলাম। তাঁরা সবাই বাবাকে বলছেন, খবর আছে, আজ রাত্রে আপনার বাড়ি আক্রান্ত হবে। আপনি স্কুলের হেডমাস্টার। চলুন সবাইকে নিয়ে অফিসার পাড়ায়, নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে আপনাদের পৌঁছে দিই। বাবা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা বোঝাতে লাগলেন, সরে গেলে সকলেই নিরাপদ হবেন। আর না গেলে, একটি বাড়ির জন্য এ-পাড়ার সবাই বিপন্ন হবেন। কোনটা ভাল? শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি, সকলে যাওয়ার জন্য তৈরি।

শুনলাম, ঠিক হয়েছে দাদা শুধু থাকবেন এ বাড়িতে, বাকি সকলে চলে যাবে ও পাড়ায়। ছেলেবেলাকার সেই রাত্রিটার কথা সবসময় আমার মনে পড়ে। একটা লণ্ঠন হাতে ঘুম-ঘুম

চোখে মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছি। লক্ষ্য অফিসার পাড়ার নিরাপদ আশ্রয়। পথ চলতে-চলতে আমার মনের মধ্যে একটা মিশ্র অনুভূতি হচ্ছে। একদিকে ভয়, অন্যদিকে লজ্জা। পালিয়ে যাওয়ার লজ্জা।
মনে হচ্ছিল, কাল ইস্কুলে পৌঁছলে বন্ধুরা যদি জিজ্ঞেস করে, কী বলব তাদের? কী বলবেন বাবা?

যা ভয় পাচ্ছিলাম তা-ই ঘটে গেল। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আনোয়ার পরদিন খানিকটা বিস্ময়ে, খানিকটা ক্ষোভে জিজ্ঞেস করল, "তোরা নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিস? কেন রে?" আমি কোনও উত্তর দিতে পারিনি। সেই লজ্জাটা এখনও আমাকে তাড়া করে।

আর-একরকম পালানোর একটা ঘটনা ১৯৫০ সালের। তখন আমি প্রসিডেন্সিতে বি.এ. পড়ছি। কলেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা অভ্যাস হয়েছিল পরীক্ষা থেকে পালানোর। কখনও কখনও পরীক্ষার হলে ঢুকতামই না। কখনও বা ঢুকলেও বেরিয়ে আসতাম। সেবার ছিল কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষা দেব বলে বাড়ি থেকে তো এসেছি। বন্ধুদের সবাইকে পরীক্ষায় বসিয়ে দিয়ে কলেজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি মাঠে। তারপর কী করি? এদিক ওদিক হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্ট্রিট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে ভাবছি, কোথায় যাই এবার! পরীক্ষা দিতে এসেছি কাজেই বাড়ি ফেরা যাবে না। বন্ধুরাও সব পরীক্ষার হলে। ম্যাটিনি শো-এরও সময় হয়নি। এই সব সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ কে আমার পিঠে হাত রেখেছে। বাঁচা গেল। কোনও বন্ধু পাওয়া গেল। খুশি হয়ে পেছন ফিরতেই দেখি আমাদের মাস্টারমশাই দেবীপদ ভট্টাচার্য।
হাতের ডানাটা শক্ত করে ধরে বললেন, "এই যে, তুমি এখানে আর আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। চলো এক্ষুনি।" ব্যস, টানতে টানতে নিয়ে চললেন কলেজের গেটের দিকে। আমি কিছুতেই যাব না, উনিও ছাড়বেন না। রেলিং ঘেরা পুরনো বইয়ের দোকানিরা ছাত্র-শিক্ষকের এই 'টাগ অব ওয়ার' দেখে হাসছেন।
কলেজের বারান্দায় উঠতেই কাতর গলায় বলি, "এখন তো অনেক সময় চলে গেছে, এখন পরীক্ষা দিলে তো পাশ করব না।" মাস্টারমশাই নির্দ্বিধায় বললেন, "সেটাই তো দেখতে চাই, পরীক্ষা দেবে আর দিয়ে ফেল করবে, সেটাই দেখব।"
তিনতলায় পরীক্ষার ঘরে ঢুকিয়ে অর্থনীতির তরুণ অধ্যাপক তাপস মজুমদারকে বললেন, "ওকে কাগজ আর প্রশ্নপত্র দাও তো।" তাপসবাবু বললেন, "কিন্তু একঘণ্টা তো হয়ে গেছে—এখন প্রশ্নপত্র?" দেবীবাবু বলেন, "তাতে কিছু হবে না, আমি বলছি দিয়ে দাও! আর লক্ষ রেখো, যেন পালিয়ে না যায়। ওর একটু পালাবার অভ্যাস আছে।" বন্ধুরা আমার দশা দেখে কৌতুকে হাসছে। দুঃখী মুখে খাতা নিয়ে লিখতে শুরু করলাম আমি। আমাদের ছাত্রাবস্থায় এরকমই ছিল ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক। পরীক্ষা-পলাতক ছাত্রকে পথে-পথে খুঁজে বেড়াচ্ছেন এক মাস্টারমশাই!
সেই মাস্টারমশাইয়েরই আর-একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমি তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি তাঁর সহকর্মী হয়ে। '৭০ সাল, নকশাল আন্দোলন তুঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে তুমুল উত্তেজনা প্রায় প্রতিদিনই। দুটি দলের ছাত্রদের মধ্যে হানাহানি লেগেই আছে। সেরকম একদিন আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি। বাস থেকে নামার ঠিক এক স্টপ আগে কয়েকটি ছাত্র লাঠি হাতে উঠে এল বাসের মধ্যে। কাউকে খুঁজছে নিশ্চয়। পরের স্টপেই নামলাম আমি। ওরাও। কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা? কিছু একটা গোলমাল জট পাকাচ্ছে এটা বুঝে আমি তখন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। পরের বাস থেকেই নেমে এলেন দেবীবাবু। আর ঠিক সেই বাসেরই একটি ছেলেকে দেখে ওরা মারমুখী হয়ে ধেয়ে গেল, লাঠি হাতে ঘিরে ধরল ছেলেটিকে! ছেলেটিকে ওরা হয়তো মেরেই ফেলবে। মুহূর্তে এক কাণ্ড ঘটে গেল। কিছু বুঝবার আগেই দেবীবাবু ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওই ভিড়ের মধ্যে। ছেলেটিকে বুকের মধ্যে জাপটে নিয়ে বললেন, "আমাকে না মেরে ওর গায়ে হাত দিতে পারবে না।"

ছেলেরাও নাছোড়বান্দা, "আপনি কেন এর মধ্যে? ওকে ছেড়ে দিন।"
ছেলেদের ধস্তাধস্তি শুরু হল ওঁর সঙ্গে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন আসতে শুরু করেছেন। পথচারী মানুষের ভিড় জমতে শুরু করেছে। ছেলেটিকে কোনওরকমে পরের একটি বাসে তুলে দেওয়া গেল প্রধানত দেবীবাবুরই চেষ্টায়। প্রাণ নিয়ে সে বাঁচল।
পরে অলোকরঞ্জনকে ঘটনার কথা বলি কলেজের ঘরে। দেবীবাবু ঘরে ঢুকতেই তাঁর আর-এক ছাত্র অলোকরঞ্জন কিছু না বলে হঠাৎ তাঁকে প্রণাম করে।
জিজ্ঞেস করেন, "কী হল, আজ তোমার জন্মদিন?"
অলোক বলে, "না, আজ আমার গর্বের দিন। আপনি আমাদের মাস্টারমশাই, তাই গর্ব!"

স্মরণীয় সাক্ষাৎকার

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের হাত থেকে নিয়েছিলাম ডি. লিট-এর শংসাপত্র

নিমাইসাধন বসু

সময়টা ১৯৫৪ সালের জুন মাস। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি পেলাম। ভারততত্ত্ববিদ এ.এল. ব্যাসম দীর্ঘ মৌখিক পরীক্ষার পর ঘর থেকে বের হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, "ওয়েল ডান মাই বয়, ইউ হ্যাভ ডান ভেরি ওয়েল।" আমিই তখন পর্যন্ত সর্বকনিষ্ঠ ছাত্র হিসেবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. পেয়েছিলাম। ব্যাসমসাহেব আমাকে নিয়ে রেস্তরাঁয় গেলেন চাইনিজ খাওয়াতে। নামজাদা মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন ফ্রেডি মিল্‌স।

নিজের নামেই তিনি ওই রেস্তরাঁ করেছিলেন লন্ডনে। এর পর টেম্‌স নদীতে স্টিমারে চড়ালেন। শেষ বিকেলে অস্তগামী সূর্যের আলোয় নদীর জল তখন লাল। ব্যাসম সাহেব বলেছিলেন, "তুমি অনেক, অনেক বড় হবে।" আজও মনে পড়ে সেই কথা। কী আনন্দ যে হয়েছিল তা শুনে!

স্মৃতির ধূসর ধারাপাতের পাতা ওলটাতে গিয়ে মনে পড়ছে ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশের দিনটিও। পড়তাম হাওড়া বিবেকানন্দ স্কুলে। সেই সময় এখনকার মতো আগাম দিনক্ষণ ঘোষণা করে ফল প্রকাশ হত না। সফল ছেলেমেয়েদের নামের তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হত এক জায়গাতেই— কলেজ স্ট্রিটের দ্বারভাঙা ভবনের দেওয়ালে। অসফল ছেলেরা প্রায়ই সেই তালিকা ছিঁড়ে ফেলত। ফলপ্রকাশের সম্ভাব্য দিনে শেষ রাতে ট্রামে করে গেলাম ওখানে। তখন সবে আলো ফুটছে। তার মধ্যেই দেখি কত ছেলে জমে গিয়েছে। তালিকা লাগানোও হয়েছিল। এ ওর ঘাড়ে উঠে তালিকা দেখছে। সে হইহই ব্যাপার। কী উত্তেজনা!

আনন্দ, উত্তেজনার পরে আসি বিষাদের কথায়। বাবা-মায়ের মৃত্যুর ঘটনা বাদ দিয়েও দুটি বিশেষ দিন মনে পড়ছে। ছেলেবেলা থেকেই ছিলাম ফুটবলপাগল। আমাদের বাড়ির সবাই ছিল মোহনবাগানের কট্টর সমর্থক। '৫২ থেকে '৫৪ লন্ডনে থাকার সুবাদে সার স্ট্যানলি ম্যাথুজের খেলা দেখেছিলাম অনেকবার। ফুটবল খেলে 'সার' উপাধি তিনিই প্রথম পান। লন্ডনে আমি যেখানে থাকতাম, তার পাশেই ছিল হাইবেরি স্টেডিয়াম। খেলা দেখতে-দেখতে আর্সেনাল দলের দারুণ ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম। এখনও ব্রিটিশ কাগজ খুলে ওদের খেলার খবর পড়ি। সে যা-ই হোক, আরও আগের কথা। কলকাতায় আই এফ এ শিল্ডের খেলা চলছে। সেমিফাইনাল খেলা, মোহনবাগান আর পুলিশের মধ্যে। এ তো দানব আর লিলিপুটের লড়াই। ধরেই নিয়েছিলাম মোহনবাগান জিতবে অনেক গোলে। তখনও 'টাইব্রেকার' প্রথা চালু হয়নি। তিনদিন খেলা হল। প্রতিবারই গোলশূন্য ড্র। বাংলার লাটসাহেব তখন ছিলেন আর.জি. কেসি। তিনিও অবাক হয়ে বললেন, এ কী হল।

চতুর্থ দিনের খেলাও হল। পুলিশ মোহনবাগানকে হারিয়ে দিল এক গোলে। শোকে আমাদের তো নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে

নিমাইসাধন বসু ফোটো : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেওয়ার মতো অবস্থা।

দুঃখের অপর দিনটি '৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি। ওইদিন জাতির জনক মহাত্মা গাঁধীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। একান্তে কেঁদেছিলাম। মনে হয়েছিল, তাঁকে ছাড়া ভারতবর্ষ চলবে কী করে? তাঁর দাহের দিন খালিপায়ে গিয়েছিলাম গঙ্গাস্নান করতে।

ইন্দিরা-রাজীবের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল ভীষণ নিবিড়। দেশ-বিদেশের অনেক স্বীকৃতি পেয়েছি। সেরা স্বীকৃতির কথা উঠলে প্রথমেই অবশ্য বলব লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. প্রাপ্তির কথা। এই সম্মান ভারতে সামান্য কয়েকজন পেয়েছেন। '৭১ সালের জুন মাসের এক দিন হাওড়ার বাড়িতে একটা খাম এল লন্ডন থেকে। উৎকণ্ঠা, আশা-নিরাশার মাঝে খামটা নিয়ে ছাদে চলে গেলাম। খুলতে সাহস হচ্ছিল না। হঠাৎ লক্ষ করলাম খামের ওপর লেখা 'নিমাইসাধন বসু, ডি. লিট.'। ব্যস, ওই পোশাক পরেই ছুটতে-ছুটতে গিয়ে হাজির হলাম কাছেই এক আত্মীয়ের বাড়িতে। বিকেলে বাবা ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন। ওখানে গিয়েই আনন্দে-উত্তেজনায় বাবাকে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, "বাবা, আমি লন্ডন থেকে ডি.লিট. পেয়েছি।" আমাদের দু'জনের চোখেই তখন জল। বাবা বললেন, তাঁর জীবনেও ওটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। পরস্পরকে আমরা জড়িয়ে রেখেছিলাম অনেকক্ষণ। ১৯৭২ সালে লন্ডনে গেলাম ডি. লিট. নিতে। সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়েছিল অ্যালবার্ট হলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার স্বয়ং রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। তাঁর কাছ থেকে নিলাম দুর্লভ সম্মানের প্রশংসাপত্র। এ অভিজ্ঞতা কখনও ভুলব না।

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

বিমান নামাতে কয়েক মিনিট দেরি হলে ঘটতে পারত মারাত্মক দুর্ঘটনা

দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে পড়ছে সেই 'ক্র্যাশ-ল্যান্ডিং'-এর কথা। সঠিক দিনক্ষণ ভুলে গিয়েছি। তবে পাইলট-জীবনের গোড়ার দিকের কথা। ওই ল্যান্ডিংয়ে যদি কোনও বিপত্তি হত, হলফ করে বলতে পারি অন্য কোনও মহিলা আর সহজে আমাদের দেশে বিমানচালনায় আসতে পারতেন না। আমি মহিলা বলেই বোধ হয় অসম্ভব ঠাণ্ডা মাথা আর সংযমের পরিচয় দিয়ে সে-যাত্রায় বাঁচাতে পেরেছিলাম ফকার ফ্রেন্ডশিপের ৪০ জন যাত্রীকে। ঘটনাটি বলার আগে একটু জানানো দরকার, কীরকম লড়াই করে বিমানচালক হতে হয়েছিল আমাকে। বাবা ছিলেন ডিফেন্সের 'অ্যাকাউন্ট্যান্ট'।

বদলির চাকরি। কখনও ঝাঁসি, কখনও দেরাদুন, কখনও মিরঠ—এভাবে ঘুরে বেড়াতে হত। যখন পটনায় ছিলাম আমাদের এক পড়শি এসে খবর দিলেন সেখানকার ফ্লাইং ক্লাব মেয়েদের বিমান চালানো শেখাবে। ওই সময় কোনও মেয়ে এই পেশায় আসার কথা সহজে ভাবতে পারত না। আমি শিখতে শুরু করলাম। তালিম-শেষে পটনার ডাক্তার আমাকে চোখের পাওয়ারের জন্য 'মেডিক্যালি আনফিট' বলে ঘোষণা করলেন। নেভিগেটরের কোর্সও করলাম। এসব ১৯৫৬ সালের কথা। সার্টিফিকেট পাওয়ার পর ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে চাকরির জন্য দেখা করলাম হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে। উনি তখন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল দফতরের দায়িত্বে। বললেন, তোমাকে বড়জোর এয়ারহোস্টেসের চাকরি দিতে পারি। আমি মন্ত্রীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। টানা ১০ বছর কাজ করলাম এয়ার সার্ভে অব ইন্ডিয়া আর এয়ারওয়েজ ইন্ডিয়ায়। কিছুতেই ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে পাইলটের চাকরি পাচ্ছি না। একটাই কারণ, আর তা হল, আমি মেয়ে। মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ করতে দেওয়া যায়। কিন্তু বিমান চালানো? কখনও না। ইন্দিরা গাঁধী ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। তাঁকেও অভিযোগ জানালাম। শেষ পর্যন্ত লেগে থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে চাকরি পেলাম '৬৬-তে। স্মরণীয় অনেক ঘটনাই মনে পড়ে। '৬২-র ভারত-চিন যুদ্ধে অস্ত্র বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। তেজপুরে উত্তর-পূর্ব ঘাঁটিতে যেতে হয়েছিল সেনা নিয়োগের জন্য। একবার খাবার ছাড়া টানা আটদিন দুর্গম এক জায়গায় আটকে থাকতে হল। রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে সময় কাটিয়েছিলাম।তবে সবচেয়ে মনে রাখার মতো ঘটনা বলতে মনে পড়ে জীবনের গোড়ার দিকের ওই ক্র্যাশ-ল্যান্ডিংয়ের কথা। ফকার ফ্রেন্ডশিপের 'কম্যান্ড' অর্থাৎ পূর্ণ দায়িত্ব ছিল আমার হাতে। মেয়েরা বিমান চালাতে পারে, এই কথা তখনও কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস হচ্ছিল না। বিমানে একদল বরযাত্রীও ছিলেন। কলকাতা থেকে আগরতলা যাবে বিমান। আবহাওয়া প্রথম থেকেই খুব খারাপ। ভরদুপুরেও আলো কম। তবুও উড়লাম ওপরওয়ালাদের কথায়। ঢাকার কাছে যাওয়ার পর আর এগনো যাচ্ছে না। আগরতলাও বলল, ওখানে অবস্থা খুব খারাপ। কলকাতাকে জানালাম, ফিরে

দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোটো : গৌতম চট্টোপাধ্যায়

আসছি। বিমানের দু'জন সেবিকা আমাকে এসে বললেন, বরের ৮০ বছরের বৃদ্ধা ঠাকুমা ভীষণ অনুরোধ করছেন আগরতলায় যাওয়ার জন্য। আমি এত যাত্রীর প্রাণের ঝুঁকি তবু নিতে পারলাম না। অবস্থা তখন খুবই খারাপ। কলকাতায় নামার মুখে একটা বড় বোয়িং এসে গেল। ওটাকেই আগে নামার সুযোগ দেওয়া হল। আমি আবার উঁচুতে উঠে চক্কর খেতে লাগলাম। অনেক সময় লাগছিল। বিমানের পেট্রোল কমে আসছে। 'রাডার' ভাল কাজ করছে না। আমি বিমান নিয়ে রওনা হলাম জামশেদপুর। কলকাতার সঙ্গে বেতার-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 'এমার্জেন্সি-ল্যান্ডিং' করার দরকার হচ্ছে। ফাঁকা মাঠ খুঁজছি। যাত্রীদের সবাইকে 'সিট-বেল্ট' বাঁধার নির্দেশ দিলাম। খড়্গপুরে সেনাবাহিনীর একটা এয়ারফিল্ড ছিল জানতাম। ভাবলাম, সেখানে যদি নামা যায়। কোনওরকমে যোগাযোগ করলাম। ওরা কলকাতার অনুমতি নিতে চায়। আমি তখন খালি ভগবানকে ডাকছি। প্লেনের পেট্রোল তখন প্রায় শেষ। খড়্গপুর শেষ পর্যন্ত ওখানে নামার অনুমতি দিল। ট্যাঙ্কার শেষ হয়ে গিয়েছে। বিমান কোনওরকমে নামল, কিন্তু 'এয়ারস্ট্রিপ' থেকে অনেক দূরে। শেষ পর্যন্ত বিশেষ গাড়ি নিয়ে ওরা টেনে নিয়ে গেল আমাদের ফকারটিকে।

আমি সেনা-অফিসারদের বললাম, বিমানে একদল বরযাত্রীও আছেন। অফিসাররা সবাইকে খুব যত্ন করেছিল। একদিন পরে যাত্রীদের নিয়ে ফিরলাম কলকাতায়। আজও ভাবি, আর কিছুক্ষণ দেরি হলেই কত বড় দুর্ঘটনা হয়ে যেত। সেইসঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত অন্য কোনও বাঙালি মেয়ের পাইলট হওয়ার স্বপ্ন।

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের দ্বিতীয় মহিলা পাইলট এসেছিলেন আরও ১৩ বছর পরে ১৯৭৯ সালে।

স্মরণীয় সাক্ষাৎকার

জাহানারার মতো সত্যিকারের শিক্ষাব্রতী খুব কমই দেখেছি

অসীম বর্মন

সেই দুই যুবকের কথা এখনও মনে পড়ে। বিশেষ কারণে ওদের নাম বলতে চাই না। পুলিশের খাতায় অপরাধীদের তালিকায় বেশ ওপরের দিকেই নাম ছিল ওদের। প্রভাব খাটিয়ে সেই নাম পুলিশের খাতা থেকে কাটিয়ে ওদের চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।

সাতের দশকের শেষ পর্ব। আমার কর্মজীবনের গোড়ার দিক। আমি তখন

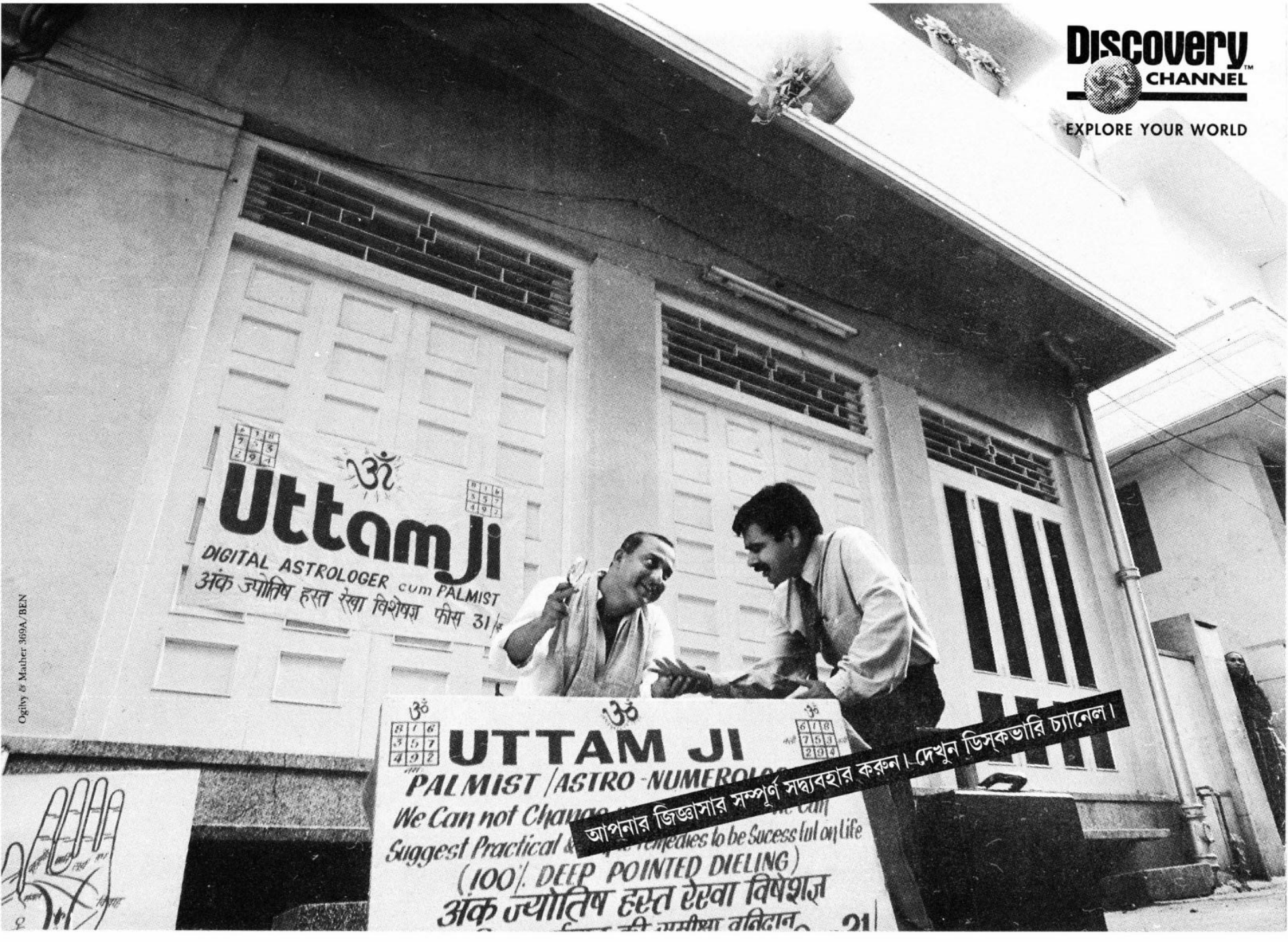

Ogilvy & Mather 369A/BEN

ঝাড়গ্রামের এস ডি ও। কাছেই ছিল লোধা গ্রাম। ওই বিস্তীর্ণ এলাকায় চুরি-চামারি তো বটেই, প্রায়ই হত নানা ধরনের অপরাধ। আমি দায়িত্ব নেওয়ার আগের বছরই একদিন বেশ কয়েকটা খুন একসঙ্গে হয়ে গিয়েছিল ওই তল্লাটে। রাজ্য প্রশাসন থেকে দায়িত্ব দেওয়া হল, ওই লোধা গ্রামের অপরাধ কমাতে হবে। গ্রামবাসীদের দিতে হবে স্বনিযুক্তির সুযোগ।

ব্যাপারটা কিন্তু খুব একটা সহজ ছিল না। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই লোধারা অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার ওদের ওপর থেকে এই নেতিবাচক তকমা তুলে নিলেও গোড়ার দিকে ওদের মূল জীবনস্রোতে ফিরিয়ে আনার তেমন চেষ্টা হয়নি। লোধা গ্রামে সাধারণ মানুষ প্রায় যেতেনই না। ওদের সবাই ভয় পেতেন। এরকম একটা পরিস্থিতিতেই ঠিক হল ওই লোধা গ্রামে হবে সেচ প্রকল্প। প্রকল্পটি সম্পর্কে লোধাদের মনে ইতিবাচক ধারণা তৈরি করা হয়। কাজে ওদের শামিলও করা গিয়েছিল। এই ব্যাপারে সহযোগিতা পেয়েছিলাম মহাশ্বেতা দেবীর।

লোধা গ্রামে প্রায় অনেক টাকার প্রকল্পের কাজ শেষ হল। এবার এর দেখাশোনার জন্য লোক দরকার। বাইরের কাউকে এ-ব্যাপারে সেখানে পাঠানো যাবে না। আবার লোধাদের মধ্যে সেই সময় শিক্ষার অভাব এত বেশি ছিল যে, ওদের মধ্যে উপযুক্ত কাউকে পাওয়াও মুশকিল। খুঁজতে শুরু করলাম ওদের মধ্যেই। কাজ চালানোর উপযুক্ত দু'জনকে পেলাম ঠিকই, কিন্তু পুলিশের খাতায় ওরা নাকি অপরাধী। অনেকেই বললেন, ওদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা ঠিক হবে না। আমি শুনলাম না। জেলা পুলিশ সুপারকে বললাম, দায়িত্ব নিচ্ছি আমি। সরকারি চাকরির জন্য ওদের ওপর থেকে সব অভিযোগ প্রত্যাহার করা দরকার। এস পি ওই অনুরোধ রাখলেন। দুই লোধা যুবক সরকারি চাকরি পেল। খুব নজর রাখতাম ওদের ওপর। শিগ্‌গিরই আমি অবশ্য বদলি হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা দু'জন আর কোনও অপরাধ করেছে বলে শুনিনি। চাকরিতে নাকি উন্নতিও করেছে ওরা।

কলকাতায় পুর কমিশনার হিসেবে আসার পর কাজের ধরন এমন হয়ে গেল যাতে বৃহত্তর উন্নয়নের তেমন সুযোগ ছিল না। '৮৪ সালের জুন মাসে এই পদে দায়িত্ব নিয়েছিলাম। বছরখানেক পরেই অবশ্য মাদার টেরিজার সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেও এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসের লাগোয়া একটি জমির মালিকানা-সংক্রান্ত সমস্যা এবং তপসিয়ায় মিশনারিজ অব চ্যারিটির একটি প্রকল্পের ব্যাপারে উনি আমাদের বিশেষ সহযোগিতা চান। আমি যথাসাধ্য পাশে দাঁড়িয়েছি। সেই কথাও মনে পড়ে।

আর মনে পড়ে জাহানারার কথা। বর্ধমানের আউশগ্রামের এক মাঝবয়সী গৃহবধূ জাহানারা দারুণভাবে অংশ নিয়েছিলেন আমাদের সাক্ষরতা অভিযানে। আমি বর্ধমানের প্রশাসক হিসেবে দিনরাত খাটছি সরকারি অভিযানটিকে সফল করতে। কখনও কালনা, কখনও কাটোয়া, কখনও আসানসোল, কখনও চিত্তরঞ্জনে যাচ্ছি। জেলায় প্রায় ৪০ হাজার শিবির করেছিলাম এই অভিযান সফল করতে। দুর্গাপুরে কাঁকসার কাছে গুসকরায় আদিবাসী পল্লীর নিরক্ষরদের পড়াশোনা শেখাতে জাহানারা নিয়মিত যেতেন। কোনও প্রাপ্তির আশা না করেই। '৯১-'৯২ সালের কথা। বছর ২৪ বয়সের আর-এক মহিলাকে দেখেছিলাম শিক্ষাপ্রসারের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে। সাধারণত সরকারি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীরাই শিবিরের ক্লাস নিতেন। কিন্তু ওই মহিলার পড়ানোর পদ্ধতি ছিল অনেক উন্নত। আমরা সেই পদ্ধতির কথা 'সার্কুলার' করে বিভিন্ন শিবিরে জানিয়ে দিই। গ্রামেগঞ্জে এরকম কর্মনিষ্ঠ কয়েকজন আমাদের অভিযানকে এগিয়ে দিয়েছিলেন বেশ কয়েক ধাপ। জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল দক্ষিণের এর্নাকুলম। বর্ধমান হয়েছিল দ্বিতীয়। কলকাতায় হকার বা হোর্ডিং উচ্ছেদ অভিযানের সাফল্যের চেয়েও আমি মনে করি প্রায় দেড় যুগ আগেকার বর্ধমানের ওই অভিযানের সাফল্যের স্বাদ অনেক, অনেক বেশি।

(এর পর ৫৭ পাতায়)

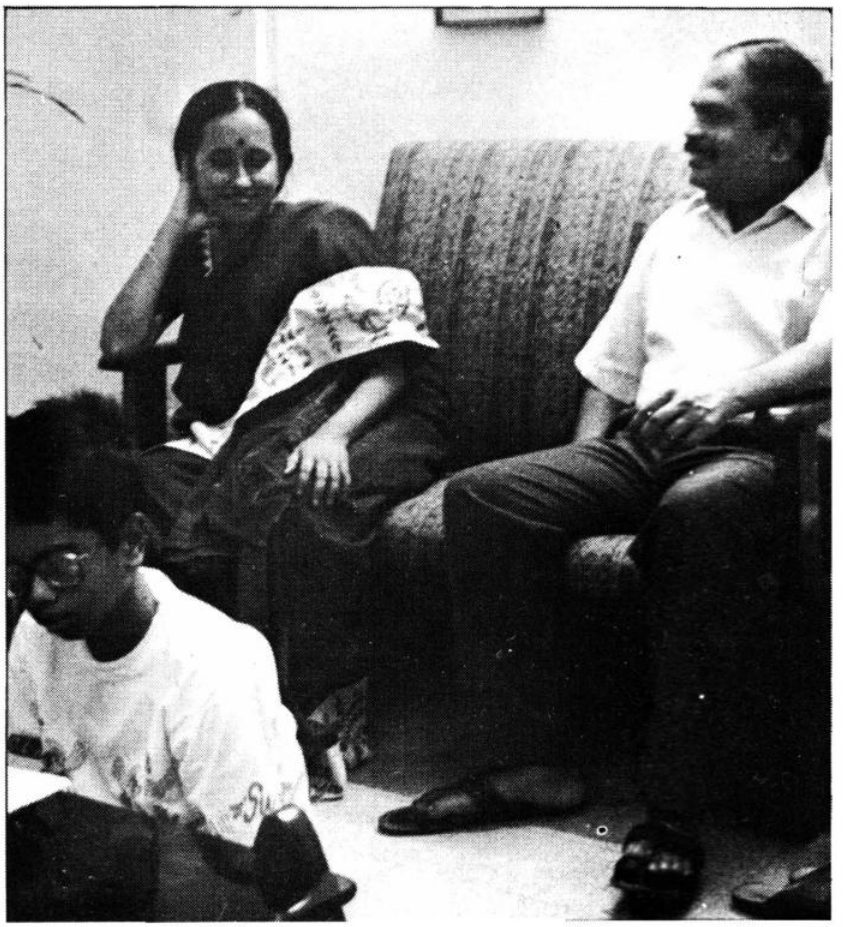

কলকাতা পুরসভার কমিশনার অসীম বর্মন

ফোটো : অমিত দত্ত

DIST. BY ASIA FEATURES

E-MAIL: ARCHIE COM@AOL.COM

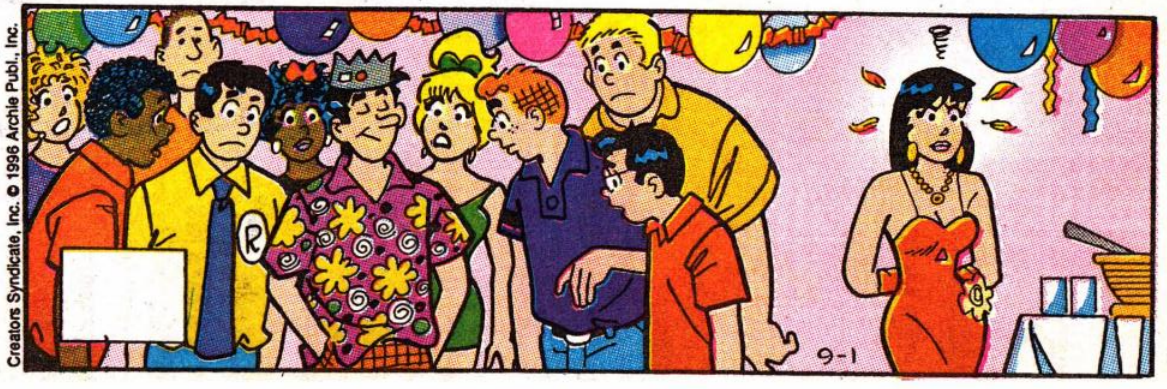

Creators Syndicate, Inc. © 1996 Archie Publ., Inc.

(২০ পাতার পর)

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

অন্তহীন সমুদ্রে সেদিন প্রাণ বাঁচিয়েছিল অ্যালবাট্রস

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই কবে কোন কালে দীর্ঘ এক সমুদ্রযাত্রায় বের হয়েছিলাম, এখন আর সব কিছু স্পষ্ট মনে নেই ; সাল তারিখও ভুলে গেছি। তবে কিছু স্মৃতি এখনও ছবি হয়ে মগজে ভেসে আছে। নিউপ্লাইমাউথ বন্দর থেকে আমরা যাচ্ছি সামোয়া। ১০-১২ দিন লেগে যাবে। সামোয়াতে আমাদের রসদ নেওয়ার কথা। মাঝদরিয়ায় তখন জাহাজ। পাঁচ-সাতদিন হয়ে গেছে আমরা বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। দুপুরের দিকেই মনে আছে জাহাজে অ্যালার্মিং বেল বেজে উঠল। ট্রান্সমিটার রুমে কোনও জরুরি খবর। রেডিও অফিসার ছুটে বাইরে এসে সিঁড়ি ধরে ব্রিজে উঠে গেছেন। দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছেন, "সার সামথিং রং। ট্রান্সমিটারে অদ্ভুত সব খবর আসছে।" সঙ্গে-সঙ্গে কাপ্তান, চিফ অফিসার নীচে নেমে এলেন। জাহাজিরাও বোট ডেকে কেউ-কেউ দৌড়ে উঠে গেছে। আমি উইন্‌চে কাজ করছিলাম, এক দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে বোট-ডেকে। সবাই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। রেডিও অফিসার বললেন, "এস ও এস আসছে। কিন্তু কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না।" রেডিও অফিসার এটা-ওটা টিপছেন আমরা সবাই বোট ডেকে ভিড় করে আছি, ট্রান্সমিটার রুমে কর্কশ শব্দ— কানে তালা লেগে যাচ্ছে— কোথাও সমুদ্রে আগুন লেগেছে— মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি— অগ্নিকাণ্ডের ভেতর জাহাজ ডুবে গেলে যা হয়— কখনও যেন কেউ হাত তুলে বাঁচাও বাঁচাও বলছে— ছোটাছুটি, দাপাদাপি, তেলের পিপে ফাটার শব্দ— হুড়মুড় করে কিছু পড়ে গেল যেন। রেডিও অফিসার প্রচণ্ড খেপে গেছেন, আর চিৎকার করে বলছেন, "শুনতে পাচ্ছেন সার, শুনতে পাচ্ছেন না, ওই তো শুনুন আবার আর্ত চিৎকার, কাছাকাছি কোথাও জাহাজডুবি হচ্ছে মনে হয়।" অথচ কোথায় জাহাজডুবি, আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমরা সাধারণ জাহাজি, সবকিছু জানার কথাও নয়, দূরে চারপাশে যতদূর চোখ যাচ্ছে— নিস্তরঙ্গ সমুদ্র— দু-একটা পরপয়েজ অথবা উড়ুক্কু মাছের ওড়াউড়ি— চিফ অফিসার দূরবিনে দূরে, আরও দূরে সমুদ্রে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এমনকী চারপাশে দিগন্তের কোথাও ধোঁয়াও দেখা যাচ্ছে না। জাহাজে আগুন লেগে গেলে, কিংবা তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন লেগে গেলে ধোঁয়া তো উঠবেই। তখনই কাপ্তান, রেডিও অফিসারকে বললেন, "জলদি এরিয়া স্টেশনকে খবর দাও, বলো আমরা খবর পাচ্ছি, সমুদ্রের কোথাও জাহাজে আগুন লেগেছে। জাহাজ ডুবছে। ওরা রেস্কিউ চাইছে। কিন্তু রেডারে কিছু আসছে না। চারপাশে কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না।" আর তখনই রেডিও অফিসার কানে ইয়ার-ফোন লাগিয়ে হেঁকে যাচ্ছেন,"হ্যালো,

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

হ্যালো, এরিয়া স্টেশন, জিরো টু টু থ্রি... হ্যালো সিওল ব্যাঙ্ক বলছি। রাউন্ড ফর সামোয়া;"এবং তিনি আরও জোরে দ্রাঘিমা অক্ষাংশের খবর দিতে হাত-পা শিথিল করে ফেললেন। বললেন, "নো রেসপন্স সার।" আর চিফ মেটের মুখ থেকে ফ্যাস করে কথাটা বের হয়ে গেল, "স্ট্রেঞ্জ!" কিউ. টি. জি বারবার চেয়েও রেডিও অফিসার যখন বিফল, তখনও শুনছি রিসিভারে সেই হাহাকার শব্দ। তারপরই প্রচণ্ড দাবদাহের মতো বিস্ফোরণের শব্দ, যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জাহাজের একটা দিক উড়ে গেছে, রেডিও অফিসার মাংকি আইল্যান্ড থেকে ছুটে নেমে যেতে পারলে যেন বাঁচেন। কাপ্তান ব্রিজে দাঁড়িয়েই আছেন, পাইপ টানছেন। সবাই তাঁর সামনে জড়ো হলে বললেন, "সামনে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই।" অফিসারদের ভিড় পাতলা হয়ে যাচ্ছিল। ফের তিনি ডেকে বললেন, "এসব যত কম জানাজানি হয় ততই ভাল।" রেডিও অফিসারকে বললেন, "তুমি চেষ্টা করে যাও, দ্যাখো এরিয়া স্টেশনকে ধরতে পারো কি না।"

বারবার চেষ্টা করেও এরিয়া স্টেশনকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। পাশাপাশি অন্য সব স্টেশনেও খবর পাঠানো হয়েছে, কোথাও থেকে কোনও জবাব আসছে না। যেন জাহাজটার সঙ্গে বাইরের সব সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জাহাজ যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। দিনের শেষেও কিছু চোখে পড়ল না। কোয়ার্টার মাস্টার মাস্তুল থেকে জাহাজের সব পতাকা নামিয়ে ফেলছে। তারপর মাস্তুলের মাথায়, ডেরিকে, এলিওয়েতে আলো জ্বালিয়ে চলে যাচ্ছে। চারপাশ ক্রমে ধূসর হয়ে উঠল। সমুদ্র বড়ই নিস্তরঙ্গ। বোট ডেক থেকে নেমে আসার সময় দেখলাম লেডি অ্যালবাট্রস মাস্তুলে বসে পাখা ঝাপটাচ্ছে। সেই কবে এই জাহাজে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গিয়ে, ডারবান বন্দরেই উঠে এসেছিল দুটো চড়ুই পাখি। জাহাজিদের কাছে তারা মিঃ এবং মিসেস স্প্যারো তখন। এবং এক বিকেলে গভীর সমুদ্রে উড়ে এল দুটো অতিকায় অ্যালবাট্রস, চড়ুই দুটোকে উড়ন্ত অবস্থায় ছোঁ মেরে ধরে ফেলল এবং গিলে ফেলল। সেকেন্ড মেট

ডেভিড ভীষণ বদমেজাজি মানুষ, মিসেস স্প্যারোর শোক সামলাতে না পেরে গুলি করে পুরুষ অ্যালবাট্রসটাকে এক রাতে মাস্তুলের ডগা থেকে নামিয়ে এনেছিলেন। কাপ্তান খবরটা পেয়ে খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন, জাহাজে এটা যে কত বড় পাপ কাজ এবং তিনি সব জাহাজিদের পাপ স্খলনের নিমিত্ত অতিকায় পাখিটাকে একজন প্রাচীন নাবিকের মতো সলিল সমাধি দিয়েছিলেন। কফিনে পাথর ঢুকিয়ে পেরেক পুঁতে বাইবেল পাঠ করে পাখিটাকে জলে ডুবিয়ে দেওয়ার পর থেকে মেয়ে অ্যালবাট্রসটার কী মনে হয়েছিল কে জানে, সে জাহাজেই থেকে গেল। পাখিটা এমনও ভাবতে পারে, পুরুষ পাখিটাকে আমরা কাঠের বাক্সে বন্দি করে রেখেছি। সে আর জাহাজ ছেড়ে কোথাও গেল না। সেই কবে ডারবান বন্দর থেকে জাহাজ যতদূরেই গেছে পেছনে পেছনে উড়ছে। ভারত মহাসাগর থেকে অতলান্তিক, তারপর প্রশান্ত মহাসাগরেও আছে সে আমাদেরই সঙ্গে। জাহাজ যে তার সমস্ত সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে, পাখিটা হয়তো জানেই না। সে প্রতিশোধও নিতে পারে। যাই হোক, বোট ডেক থেকে নামার সময় কেন যেন মনে হল তার রাতের খাবার দেওয়া হয়নি। গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে গিয়ে তার কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম।

অথবা লেডি অ্যালবাট্রস কি টের পেয়েছে জাহাজের সামনে সমূহ বিপদ? এবং যদি জাহাজডুবির আশঙ্কা থাকে অর্থাৎ সেই যে সমুদ্রে সহসা কোনও বেতার সঙ্কেত থাকে না, সহসা দেখা গেছে, কোথাও কোনও চুম্বকের আকর্ষণে তলিয়ে যাচ্ছে জাহাজ কিংবা কোনও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে পড়ে গেলে, কারণ এই সমুদ্রের জলরাশির নীচে অজস্র এমন সব অদৃশ্য ভয়, আর এও তো ঠিক, যদি সমুদ্রের সেই প্রাগৈতিহাসিক জীবেরা কখনও উঠে আসে, সময় বুঝে যদি জাহাজ সমুদ্রের নীচে টেনে নামিয়ে নিয়ে যায়, অথবা যেসব অলৌকিক ঘটনা সমুদ্রে দেখা যায় মাঝে মাঝে, যেমন একবার সেকেন্ড মেট ডেভিড দেখেছিলেন, সমুদ্রে এক অতিকায় অগ্নিস্তম্ভ আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে— পাখিটাকে দেখতে দেখতে আমার এইসব কথা কেন যে মনে পড়ছিল। আর মধ্যরাতেই কাপ্তান এঞ্জিন রুমে টেলিগ্রাম পাঠালেন— স্ট্যান্ডবাই। জাহাজ সহসা থেমে গেল। অ্যালার্মিং বেল আবার বাজছে। যে যেভাবে পারছে লাইফ জ্যাকেট গায়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ডেকে উঠে দেখি, পুবের সমুদ্র অগ্নিময় হয়ে আছে। নীলাভ নক্ষত্রমালায় যেন আগুন লেগে গেছে। কেউ বলেছিল, ওটা যাত্রী-জাহাজ হবে, কেউ বলছিল, ওটা তেলের জাহাজ। সেকেন্ড টিন্ডাল মান্নান, কোত্থেকে এসে উঁকি মেরে বলল,"দুর, ওটা তিমি ধরার জাহাজ। তিমির চর্বি না হলে আগুন এত সাদা হয় না।" আর তখনই সারেঙসাবের হুকুম, মাস্তার। বোট ডেকে মাস্তার। সঙ্গে সঙ্গে পড়িমরি করে বোট ডেকে সবাই হাজির। চারটে লাইফ

রেডিও-অফিসার বললেন, "এস ও এস আসছে। কিন্তু কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না।" রেডিও-অফিসার এটা-ওটা টিপছেন, আমরা সবাই বোটডেকে ভিড় করে আছি, ট্রান্সমিটার রুমে কর্কশ শব্দ—কানে তালা লেগে যাচ্ছে—কোথাও সমুদ্রে আগুন লেগেছে.....

বোট হারিয়া করে দেওয়া হচ্ছে। কোন বোটে কে যাবে, তাও চিফ মেট ঠিক করে দিলেন, যদি সমুদ্র থেকে কোনও জাহাজডুবি মানুষকে উদ্ধার করা যায়।
এর পর সিওল ব্যাঙ্কের সার্চলাইট জ্বেলে দেওয়া হল। যতক্ষণ বোটগুলো দেখা যাচ্ছে, সামনে-পেছনে সার্চলাইটের আলো ফেলা হতে থাকল। আমাদের বলতে গেলে কারও যেন হুঁশ ছিল না। বোট প্রায় যেন উড়ে যাচ্ছিল। যত এগিয়ে যাচ্ছি, তত দেখছি জাহাজের সেই অগ্নিকাণ্ড পেছনে ছুটে পালাচ্ছে। সেকেন্ড মেট ডেভিডের বোটে আমরা চারজন উঠে এসেছি। সে-ই বোটের নিয়ামক। সহসা সে চিৎকার করে উঠল, "কী ব্যাপার ব্যানার্জি?"
আমি তার দিকে তাকিয়েই আছি।
"দ্যাখো সামনে কিছুই নেই। কোনও যেন অগ্নিকাণ্ডই ঘটেনি। একেবারে নিথর সমুদ্র।"
ডেভিড এবার ছেলেমানুষের মতো চিৎকার করে উঠল,'আমাদের এক নম্বর বোট কোথায়? তিন নম্বর চার নম্বর বোটও দেখছি না। গেল কোথায় সব।"
সত্যি কেমন ভোজবাজির মতো সব উধাও।
ডেভিড ছেলেমানুষের মতো চিৎকার করতে থাকল,"স্যামুয়েল তোমরা কোথায়?"
আমাদের চারপাশে অন্ধকার সমুদ্র ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এমনকী দূরে সিউল ব্যাঙ্ক জাহাজও আমরা আর দেখতে পাচ্ছি না।
ডেভিড খুবই হতাশ হয়ে পড়ল। চিৎকার করে উঠল,"আমার পাপ!"সেই পুরুষ অ্যালবাট্রস পাখিটার মৃত্যুর ছবি আমাদের চোখে ভেসে উঠল। তারই প্রেতাত্মার কাজ। সে আমাদের এক অজানা সমুদ্রে কুহকে ফেলে নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, "ডেভিড,বোট ফেরাও।"
এখন এই অন্ধকার সমুদ্রে জাহাজের অগ্নিকাণ্ড সহসা সমুদ্রগর্ভে অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ায় আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। আমরা সঙ্গে দূরবিন আনিনি ভুলে। এল বি সেটও ছিল না। এল বি সেট থাকলেও আমরা এস ও এস পাঠাতে পারতাম। রকেট ছুড়ে সিগন্যালিং করতে পারতাম, তাও আমরা সঙ্গে আনিনি। বোট সারারাত চালিয়েও সিওল ব্যাঙ্কের খোঁজ পেলাম না। আমরা অজানা সমুদ্রে ঢুকে গেছি বুঝতে পারছি। সিওল ব্যাঙ্কও অদৃশ্য।
আমরা সে রাতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। গভীর সমুদ্রে বোটে ভাসিয়ে কতদূর আর যাওয়া যাবে— কতদিনে কিনারা দেখতে পাব জানি না। সারা সমুদ্রে আমরা তীরের আশায় ঘুরে-ঘুরে একদিন বোটেই মরে পড়ে থাকব। হতাশায় আমরা প্রায় পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। সকাল হয়ে গেছে, আর তখনই অনেক দূরের আকাশে দেখতে পাচ্ছি সচল কিছু বিন্দুর মতো ভেসে আসছে। আমরা তাকিয়ে আছি— দেখছি লেডি অ্যালবাট্রস উড়ে আসছে। বোটে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, "ডেভিড, সে আসছে। আমাদের নিতে আসছে। ঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।" পাখিটা শেষ পর্যন্ত আমাদের ঠিক জাহাজে পৌঁছে দিয়েছিল। সমুদ্রের এই রহস্য এখনও আমাকে তাড়া করে।

(এর পর ২৬ পাতায়)

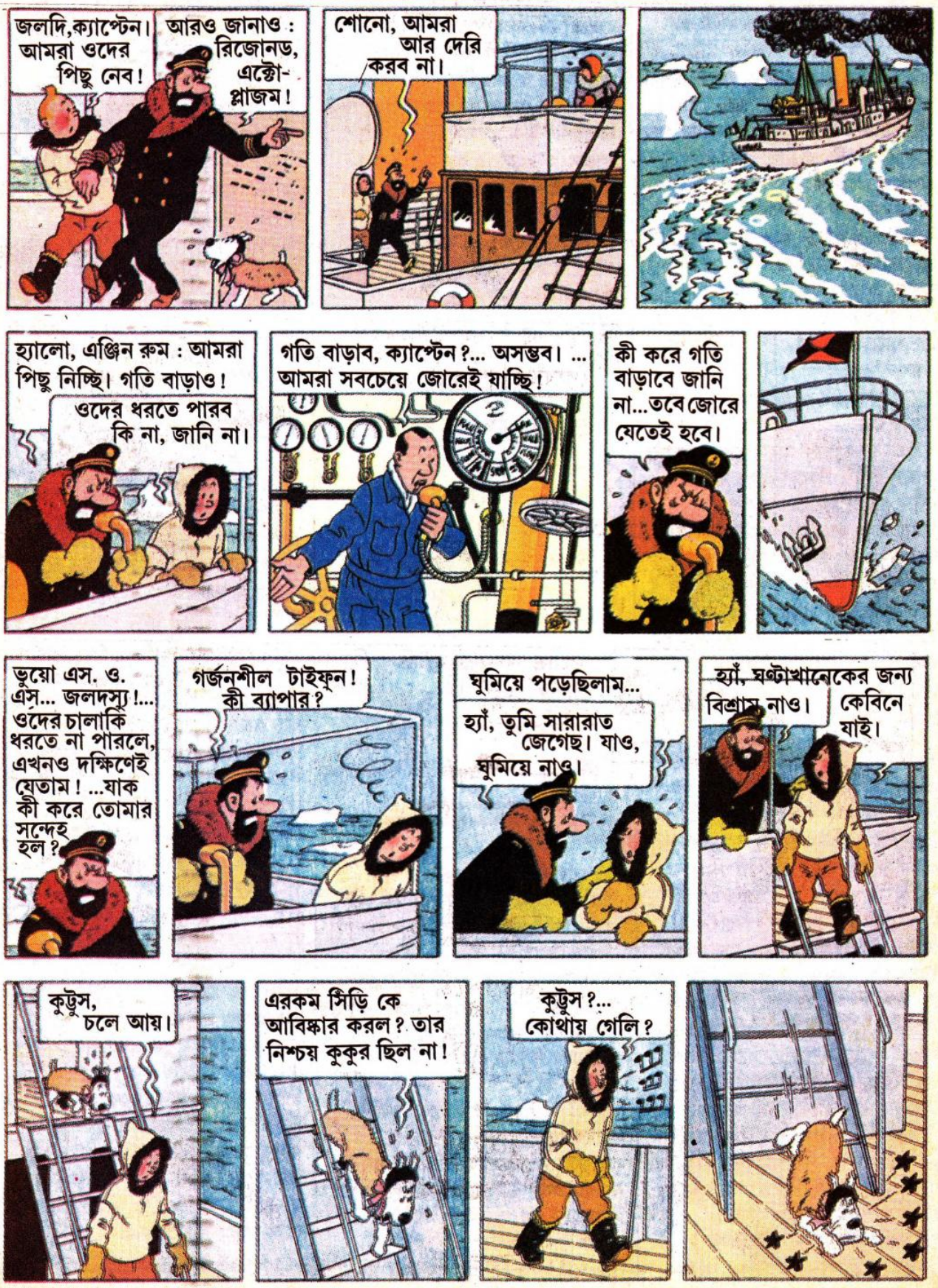
জলদি, ক্যাপ্টেন। আমরা ওদের পিছু নেব!
আরও জানাও : রিজোনড, এক্টো-প্লাজম!
শোনো, আমরা আর দেরি করব না।
হ্যালো, এঞ্জিন রুম : আমরা পিছু নিচ্ছি। গতি বাড়াও!
ওদের ধরতে পারব কি না, জানি না।
গতি বাড়াব, ক্যাপ্টেন?... অসম্ভব। ... আমরা সবচেয়ে জোরেই যাচ্ছি!
কী করে গতি বাড়াবে জানি না...তবে জোরে যেতেই হবে।
ভুয়ো এস. ও. এস... জলদস্যু!... ওদের চালাকি ধরতে না পারলে, এখনও দক্ষিণেই যেতাম! ...যাক কী করে তোমার সন্দেহ হল?
গর্জনশীল টাইফুন! কী ব্যাপার?
ঘুমিয়ে পড়েছিলাম...
হ্যাঁ, তুমি সারারাত জেগেছ। যাও, ঘুমিয়ে নাও।
হ্যাঁ, ঘণ্টাখানেকের জন্য বিশ্রাম নাও। কেবিনে যাই।
কুট্টুস, চলে আয়।
এরকম সিঁড়ি কে আবিষ্কার করল? তার নিশ্চয় কুকুর ছিল না!
কুট্টুস?... কোথায় গেলি?

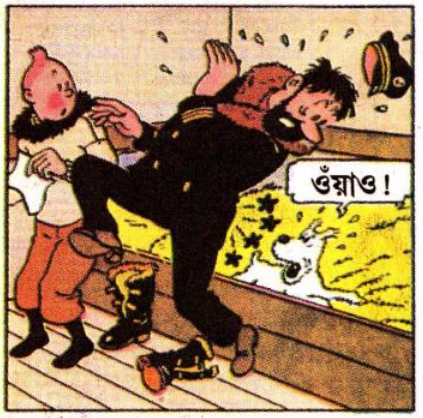

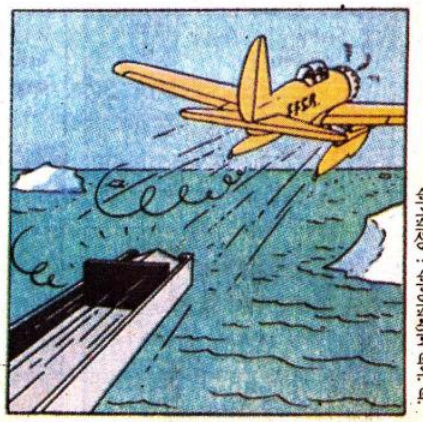

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

(২৩ পাতার পর)

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

বাংলা ধমকেই কাজ হল ম্যাজিকের মতো

যোগেশ দত্ত

বার্লিন শহরেও যে বাংলায় ধমক দিলে কাজ হতে পারে, সেটা নিজে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। আমার খাঁটি বাংলায় ধমক শুনে একেবারে সুড়সুড় করে জার্মান পুলিশ পিছু নেওয়া সবাইকে খেদিয়ে দিল। তার আগে পর্যন্ত বলতে গেলে আমার প্রাণান্তকর অবস্থা। আমার পেছনে-পেছনে ঘুরছে শ'খানেক জার্মান শিশু আর কিশোর-কিশোরী। আমার ধুতি আর পঞ্জাবি পরা চেহারা দেখে তাদের এতই অবাক লেগেছে কিছুতেই আমার পিছু ছাড়বে না। সে এক অদ্ভুত অবস্থা, না পারছি কোথাও বসতে, না পারছি ওই জার্মান শিশুদের ঝেড়ে ফেলতে।

তখনও দুই জার্মানি এক হয়নি, বার্লিন শহরের মাঝামাঝি রয়েছে বিশাল দেওয়াল। আমি পশ্চিম জার্মানি গিয়েছি সে দেশের সরকারের আমন্ত্রণে। আমার একটা অভ্যাস রয়েছে, বিদেশে গেলেই সবসময় একেবারে বাঙালি পোশাক পরে ঘুরে বেড়ানো। সেইমতো সাবেক পশ্চিম জার্মানিতেও ঘুরে বেড়াচ্ছি। একদিন সকালে উঠে মর্নিং ওয়াকে গিয়েছি একটি পার্কে। হঠাৎ দেখি আমার চারপাশে ভিড় জমে গিয়েছে। প্রথমে আমি বুঝতে পারিনি আচমকাই কেন এত আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছি। তারপরে দেখি সবাই আমার ধুতি-পঞ্জাবির দিকে হাত নেড়ে-নেড়ে কী যেন বলছে। তখন বুঝতে পারলাম ওদের কৌতূহলের কারণ আমার পোশাক। এহেন পঞ্জাবি-ধুতি আর চাদরে মোড়া লোক এর আগে ওরা দেখেনি বলেই এত বিস্ময়।

পার্কে আমায় দেখে ভিড় জমে গিয়েছে দেখে শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমি রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু দেখি সেখানেও কেউ আমার পিছু ছাড়েনি। ঠিক যেমন হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার সুরে তাঁর পেছনে সকলে চলে গিয়েছিল, তেমনই পার্কের সবাই আসছে আমার পেছনে। বলতে গেলে একটা লম্বা মিছিল তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার পেছনে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম কিছুদূর যাওয়ার পরেই বোধ হয় এদের উৎসাহে ভাটা পড়বে। কিন্তু দেখি এদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই, সবাই রাস্তায় আমায় অনুসরণ করছে। রাস্তার বাকি লোকজনও এই মিছিল দেখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত একটা দর্শনীয় বস্তুর পর্যায়ে চলে যাচ্ছি দেখে যারপরনাই বিরক্ত হচ্ছিলাম আমি। কিন্তু কিছুই করার নেই, এরা পিছুও ছাড়ে না। আমি ইংরেজিতে যতই বোঝানোর চেষ্টা করি এটাই আমাদের দেশের পোশাক, ততই ওদের কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। কারণ ওদের মধ্যে প্রায় কেউই ইংরেজি জানে না, আর জার্মান ভাষাও আমার নাগালের বাইরে। বেশ কিছুক্ষণ চলার পরে হঠাৎ রাস্তায় দেখি একজন পুলিশ। পিছু নেওয়া ভিড়ের জ্বালায় আমি বাধ্য হয়েই ওই পুলিশ কর্মচারীর শরণাপন্ন হলাম। কিন্তু সেখানেও বিপদ, তাঁরও ছিটেফোঁটা ইংরেজি জ্ঞান নেই। বেশ কিছুক্ষণ তাঁকে ইংরেজিতে, তারপরে হাত-পা নেড়ে বোঝানোর পরেও কিছুমাত্র উপকার হল না। বাধ্য হয়ে দুত্তোর বলে পরিষ্কার বাংলায় আমি তাঁকে ধমক দিয়ে বললাম, "দ্যাখো বাপু, তোমাদের দেশে এসে তো ভারী বিপদ হল। তোমরা তো আমাকে সার্কাসের ক্লাউন ঠাউরেছ। আর কেউ ভাষাও বোঝো না। এ মহা মুশকিল।" এইসব বলে আমি দিলাম এক ধমক।

যোগেশ দত্ত ফোটো : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশুদ্ধ বাংলায় এই ধমকে ম্যাজিকের মতো কাজ হল। আমার পিছু-পিছু যারা আসছিল তাদের গিয়ে ওই জার্মান পুলিশ একেবারে হটিয়ে দিল। তারপর আমার কাছে এসে হাত জোড় করে সে কী ক্ষমাপ্রার্থনা! আমি তো ওঁর ভাষা বুঝতে পারছি না, কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছি ভীষণই লজ্জিত আমার এই হেনস্থা হওয়ার জন্য। শেষ পর্যন্ত ওই জার্মান পুলিশ কর্মচারীই আমায় হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

মূকাভিনয়ের সূত্রে বলতে গেলে সারা পৃথিবী ঘুরেছি। কিন্তু এই ঘটনাটার কথা কোনওদিন ভুলতে পারব না। একদিকে যেমন স্মরণীয় 'জার্মান বাহিনী'র আমার পেছনে মার্চপাস্ট, অন্যদিকে তেমনই বার্লিনের রাস্তায় আমার খাঁটি বাংলায় ধমকও মনে রাখার মতো। সেই থেকে আমি ঠিক করে রেখেছি, যদি কোথাও ভাষার সমস্যা হয়, তবে একেবারে মাতৃভাষায় কথোপকথন চালিয়ে যাব। অনেক জায়গায় দেখেছি, তাতেই ভাল কাজ হয়।

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

ওলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ই জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা

লিয়েন্ডার পেজ

পাইলট পেন ওপেনে পিট সাম্প্রাসকে হারানোর পর গোরান ইভানেসেভিচের সঙ্গে খেলার দিন সকালে ভারত থেকে প্রচুর ফোন পাচ্ছিলাম। আর ভীষণ রেগে যাচ্ছিল বব। বব কারমাইকেল, আমার কোচ। ওর বক্তব্য, খেলার দিন সকালে এত ফোন কেন আসবে? কেন মনঃসংযোগ করব না পরের ম্যাচে? টেনিস সার্কিট এমন একটা জায়গা, যেখানে নিশ্বাস ফেলারও সময় নেই। প্রায় প্রতিদিনই

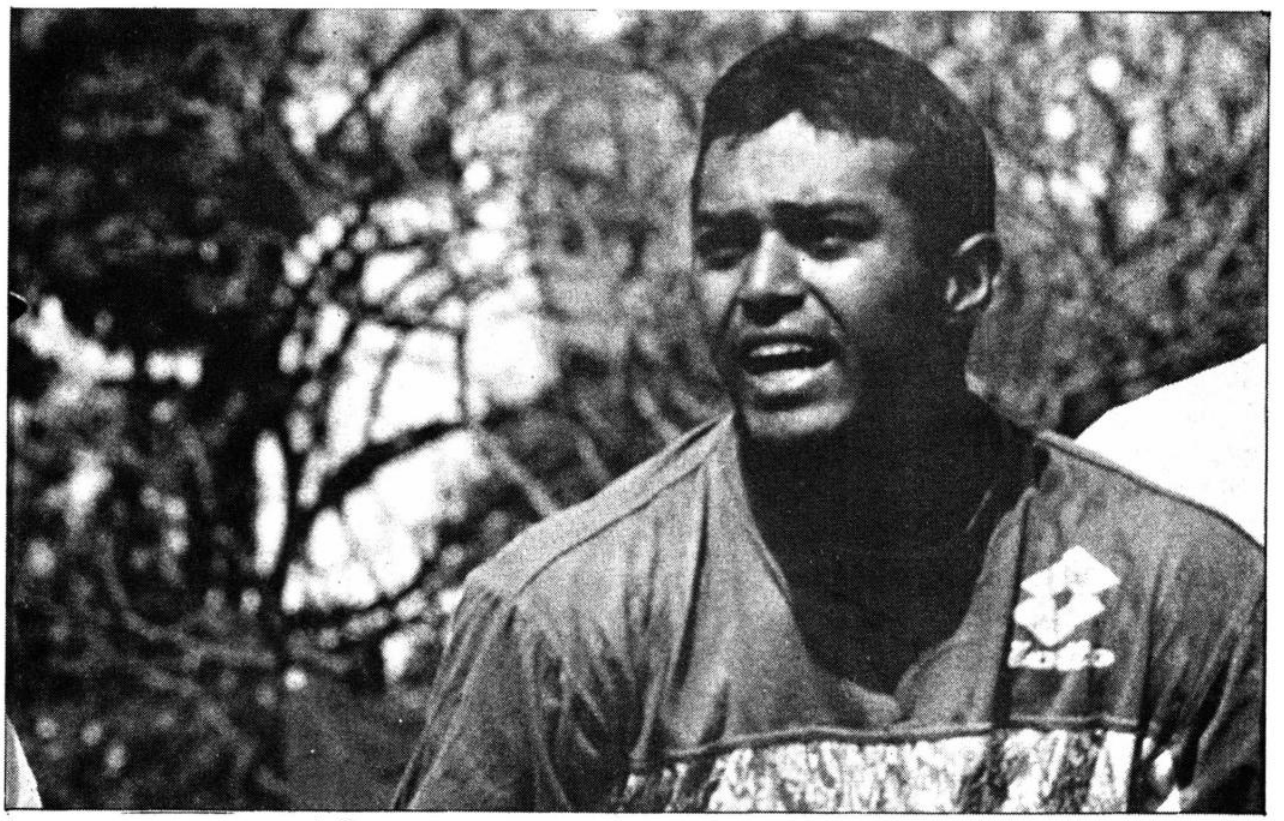

লিয়েন্ডার পেজ ফোটো : দেশকল্যাণ চৌধুরী

টেনিস, টেনিস আর টেনিস। পিটকে হারানোর সময়টায় বারবার মনে হচ্ছিল, এখনই জীবনের সেরা টেনিসটা খেলছি আমি। কোর্টে ঠিক যা করতে চাইছি, তাই করতে পারছি। কিন্তু পিট সাম্প্রাসকে হারানোটাই যে আমার জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা, তা বলতে পারছি না। আমার কাছে এখনও আগে থাকবে আটলান্টা ওলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়। দেশের হয়ে খেলে যে সবসময় অনেক বেশি আনন্দ পাই, আগেও বহুবার আমি বলেছি। ডেভিস কাপে দেশের হয়ে বেশ কিছু ম্যাচে ভাল পারফরম্যান্স আছে। সাম্প্রাসকে হারানোটা নয়, আটলান্টা ওলিম্পিকে ফার্নান্ডো মেলাজিনিকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জয়ই আমার জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা। ওলিম্পিকে খেলতে যাওয়ার আগে কখনও ভাবিনি, অতদূর পৌঁছব। তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছনোর পর থেকেই আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেভাবে খেলছি, আরও এগোতে পারি। আন্দ্রে আগাসির বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিলাম, কিন্তু লড়েওছিলাম যথেষ্ট। সাম্প্রাস হোক বা আগাসি, কোর্টে আমার কাছে তাঁরা স্রেফ প্রতিদ্বন্দ্বী, তার চেয়ে বেশি কিছু নন। আমি কখনওই ভারী নাম দেখে ম্যাচ শুরুর আগেই হেরে যাই না। শেষ পর্যন্ত নিজের সাধ্যমতো লড়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। যাই হোক, '৯৬-এর ওলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ের পর দেশে ফিরে যে সংবর্ধনা ও ভালবাসা পেয়েছি, তার সঙ্গে কোনও কিছুরই তুলনা হয় না। ওলিম্পিকে গলায় ব্রোঞ্জ পদক পরে দাঁড়িয়ে, আর ভারতের জাতীয়সঙ্গীত বাজছে; এর চেয়ে গর্বের মুহূর্ত একজন ক্রীড়াবিদের কাছে কী হতে পারে?

আজ অবশ্য আমি আর মহেশ গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের স্বপ্নও দেখি। জোর দিয়ে বলতে পারি, ডাবল্‌সে আমাদের জুটি যেভাবে খেলছে, যে-কোনওদিন গ্র্যান্ডস্লাম ডাবল্‌স খেতাব পেতে পারি আমরা। বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি, অন্যরা যেটা পারছে, চেষ্টা করলে আমরাও পারব।

(এর পর ৩০ পাতায়)

টিনটিনের অমর স্রষ্টা হার্জের ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য

ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য

কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস. এ.

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

লর্ড্‌সের ওই সেঞ্চুরি গোটা জীবনটাই পালটে দিয়েছে

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

(২৭ পাতার পর)

সেরা অভিজ্ঞতা বলতে প্রথমেই আমার মনে পড়ে লর্ড্‌সের কথা। '৯৬-এর জুন মাসের কথা। এই সেদিন অর্জুন পুরস্কার পেলাম, 'স্পোর্ট্‌স পার্সন অব দ্য ইয়ার'ও। মাত্র গত জুলাইয়ে শচীনের সঙ্গে জুড়ি বেঁধে বিশ্বরেকর্ডও হয়ে গেল প্রথম উইকেটে। জাতীয় দলের সহ-অধিনায়কও হয়ে গেছি। এই বছরটায় আমার পারফরম্যান্স খুব খারাপ নয়। কিন্তু জীবনের নানা ঘটনার ভিড় থেকে সেরা অভিজ্ঞতাটা বের করতে হলে আমি লর্ড্‌স টেস্টের কথাই বলব। সেই টেস্টের ওই সেঞ্চুরি আমার জীবনটাই পালটে দিয়েছে। চার বছর ক্রমাগত অপেক্ষা করে গিয়েছি আমি। ইংল্যান্ড সফরের আগে বারবার মনে হচ্ছিল, ডাক পেতে পারি। মনে-মনে আশা করেছিলাম। দল ঘোষণার পর ভীষণ আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু গোটা দেশে আমার নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন কথা বলা হচ্ছিল। আজ আমি অবশ্য সেসব প্রসঙ্গ তুলতে চাই না। ইংল্যান্ডে পৌঁছে যে ক'টা ম্যাচে সুযোগ পাচ্ছিলাম, কাজে লাগানোর চেষ্টা করছিলাম।

প্র্যাকটিসের অবসরে সৌরভ (বাঁদিকে) ও সিধু ফোটো : তপন দাশ

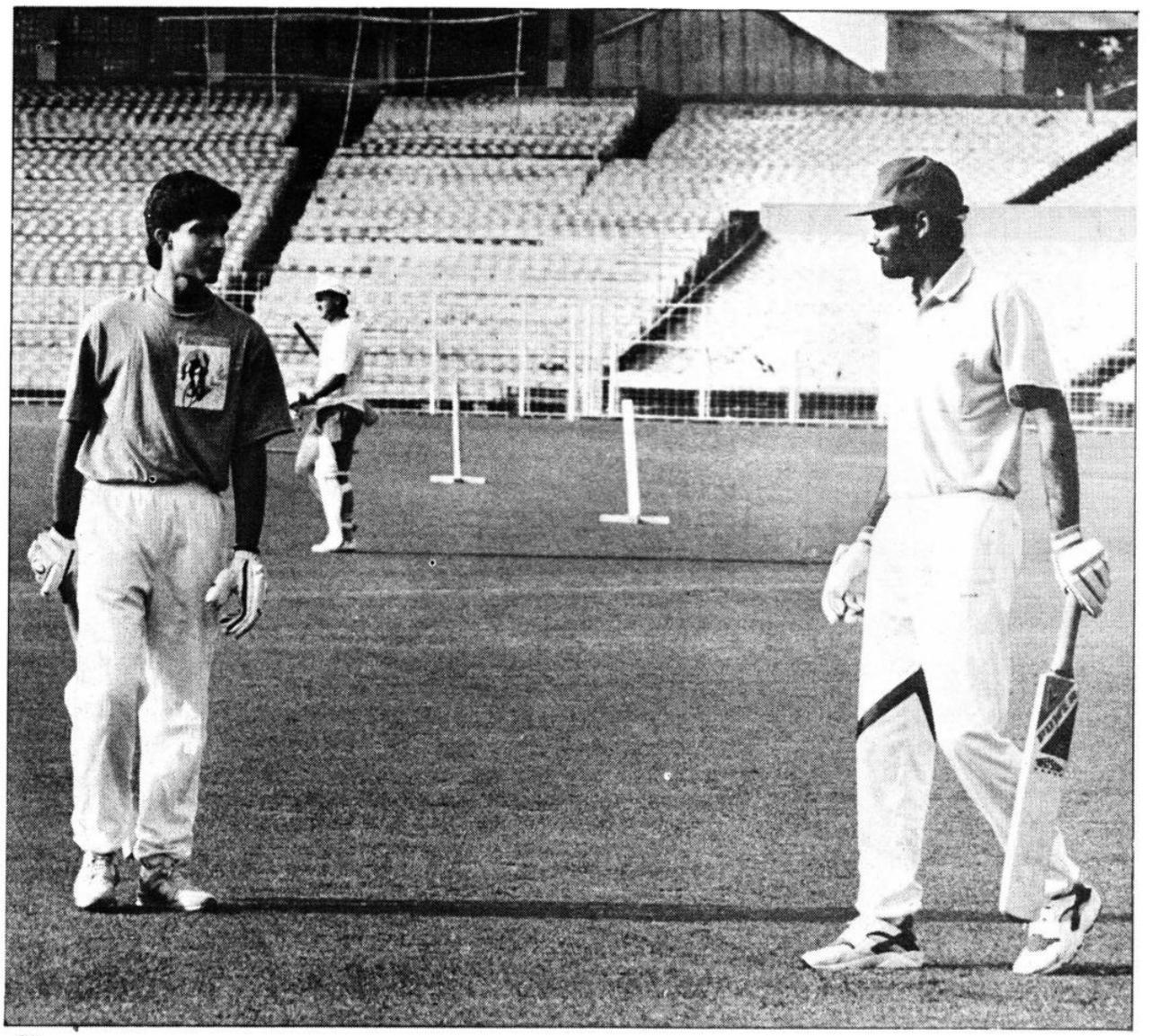

শেষ একদিনের ম্যাচটায় সুযোগ পেয়ে ৪০-এর ওপর রান করলাম। তবু নিশ্চিন্ত ছিলাম না, টেস্টে সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারে। লর্ড্‌সে দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর ঠিক আগে সিধু ফিরে গেল দেশে, চোট পেল মঞ্জরেকরও। আগের দিনই নেটে বুঝে গেলাম, আমাকে খেলানো হতে পারে। মনে আছে, শচীন খুব সাহস দিয়েছিল। বলেছিল, "আমি মনে করি, ইন্ডিয়া টিমে নিজেকে নিয়মিত করে ফেলার যোগ্যতা তোমার আছে। তুমি পারবে।" চার বছর পর সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা, আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, নিজেকে চোখে পড়াতে হলে যা করার প্রথম সুযোগেই করতে হবে। টেনশন যে অল্প হচ্ছিল না, তা নয়। কিন্তু মনে জোর রেখে আমি তা আমল দিইনি।

সেই টেস্টে আগে ফিল্ডিং করেছিলাম আমরা। বল করে দুটো উইকেটও পেলাম। কিন্তু জানতাম, সেটা কিছু নয়। ব্যাটিংয়েই যা করার করতে হবে। আমাদের ব্যাট করার সুযোগ এল দ্বিতীয় দিন বিকেলে। প্রথম বলটা ব্যাটের মাঝখান দিয়ে খেলার পরই মনে হল, কোনও অসুবিধে তো হচ্ছে না। মাথায় কোনও চিন্তা না রেখে নিজের স্বাভাবিক খেলাটা খেলে যাচ্ছিলাম। দিনের শেষে ২৬ নট আউট, কিন্তু তখনও বড় কিছু আশা করিনি। রাতে শুতে যাওয়ার সময় শুধু ঠিক করেছিলাম, বাজে ভুল করে উইকেট দেব না। যতক্ষণ পারব, উইকেটে থেকে নিজের খেলাটা খেলে যাব। সেই চেষ্টাই তৃতীয় দিন সকালে শুরু করলাম। এক সময় সেঞ্চুরিও হয়ে গেল। আউট হয়েছিলাম ১৩১ রান করে। তারপর কী হয়েছিল, সবাই জানে। নতুন করে বলার কিছু নেই। পরের টেস্টেও সেঞ্চুরি পেয়েছিলাম, 'ম্যান অব দ্য সিরিজও' হয়েছিলাম।

জাতীয় দলের হয়ে আমার প্রায় আড়াই বছর খেলা হয়ে গেল। এর পর '৯৭-এর সহারা কাপে পর পর চারটে ম্যাচে 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' হয়েছি। পাকিস্তানে গিয়ে পাকিস্তানকে করাচি ম্যাচে হারিয়েছি। আমি করেছিলাম ৮৯ রান। ঢাকায় ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপেও ৩১৪ তাড়া করে জিতেছি আমরা। আমি করেছিলাম ১২৪। দেশের হয়ে জয়ে বড় ভূমিকা নেওয়ার চেয়ে বেশি আনন্দদায়ক কিছু হতে পারে না। দেশ জিতলে আর তাতে নিজের অবদান থাকলে তার চেয়ে বড় কিছু হয়?

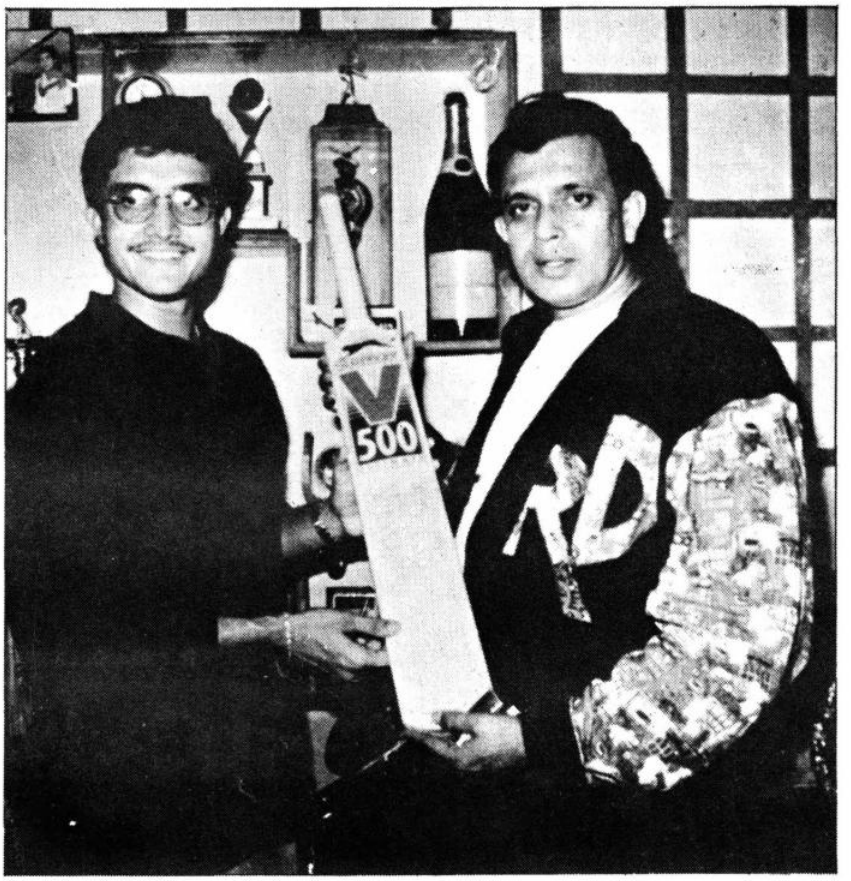

মিঠুনের সঙ্গে ফোটো: উৎপল সরকার

ফোটো : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

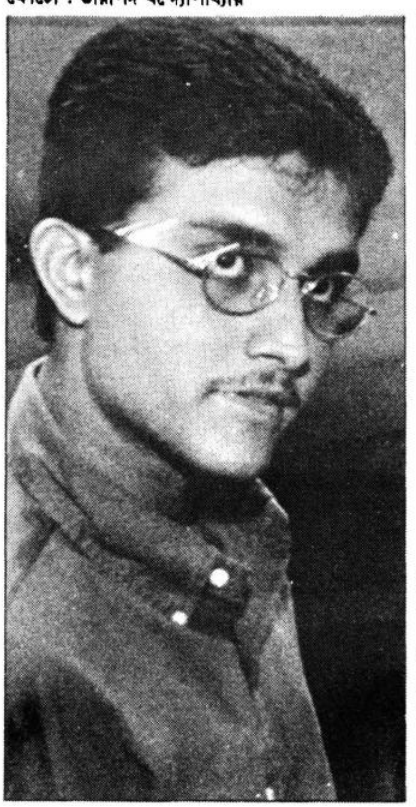

আড়াই বছর জাতীয় দলে থাকার জন্য ভারতের বেশ কিছু স্মরণীয় জয়ে অংশ নিতে পেরেছি, এজন্য আমি গর্বিত। সহারা কাপ '৯৭, ঢাকার ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ, করাচি ম্যাচ ভুলতে পারি না। ভুলি না, মুম্বই টেস্টে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৭৩। কিন্তু কোনও কিছুর সঙ্গেই লর্ড্‌স টেস্টের তুলনা হয় না। ওই সুযোগে ব্যর্থ হলে আমার কেরিয়ার ফের মুখ থুবড়ে পড়তে পারত। ইংল্যান্ড সফরের আগেই ঠিক করে নিয়েছিলাম, সুযোগ না পেলে আর বছর দুয়েক দেখব। তারপর ক্রিকেট ছেড়ে দিয়ে পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকে পড়ব। জাতীয় দলে খেলার স্বপ্ন ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি। সেই স্বপ্নই পূর্ণ না হলে খেলে কী লাভ?

লর্ড্‌সের ওই সেঞ্চুরি আমার গোটা জীবনটাই বদলে দিয়েছে। ক্রিকেটকে নিয়ে নতুন করে বাঁচছি আমি। না না, এখনও লর্ড্‌সে জীবনের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরিটাই আমার জীবনের সবচেয়ে দামি অভিজ্ঞতা। তার সঙ্গে অন্য কোনও কিছুরই তুলনা হয় না।

(এর পর ৫৭ পাতায়)

অ্যাসটেরিক্স

গল্প : গোসিনি
ছবি : ইউদেরজো

ব্রিটেনে অ্যাসটেরিক্স

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ঘরোয়া টুর্নামেন্টের বাইরে তিনি ছিলেন না কোথাও। তারপর হঠাৎ ইংল্যান্ড সফরে দলে সুযোগ এবং বাকিটা ইতিহাস। বেহালার বীরেন রায় রোড থেকে উঠে এসে এক বঙ্গসন্তান কীভাবে আজ বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম তারকা? সাফল্যের শিখরে পৌঁছনোর রাস্তাটা ঠিক কতটা পিচ্ছিল? বহু অজানা কাহিনী তুলে এনেছেন **সব্যসাচী সরকার**

॥ ১৩ ॥

লর্ডস থেকে ঢাকা

হ্যানসি ক্রোনিয়ে যেই তুলে নিলেন শচীন তেন্ডুলকরকে, তখনই দক্ষিণ আফ্রিকার 'দ্য সিটিজেন' কাগজের ট্রেভর ক্র্যামার বললেন, "হান্ড্রেড ফর থ্রি—শচীন গন। আমার মনে হয় না, এর পর ভারত ২৫০ পেরোতে পারে।"

ততক্ষণে ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে উইকেটের দিকে হাঁটা শুরু করে দিয়েছেন সৌরভ। জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সটা অনেকটা উঁচুতে। যেমন ইডেন গার্ডেন্সে। অত উঁচু থেকে ভাল করে বল বোঝা যায় না। ডোনাল্ডের একটা লেট আউটসুইং যখন একটুর জন্য সৌরভের উইকেটটা পেল না, দূরবিন চোখে লাগিয়ে দেখলাম, বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। উলটোদিকে তখন ভীষণ জমাট দেখাচ্ছে রাহুল দ্রাবিড়কে। আস্তে-আস্তে দু'জন মিলে ভারতকে ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে তুলতে লাগলেন। '৯৬-এর ইংল্যান্ড সফরেও বিপর্যস্ত আজহারের টিমকে লর্ডসে টেনে তুলেছিল এই দু'জনের ব্যাট। প্রথম দিনের শেষে রাহুল ৮১ ব্যাটিং, সৌরভ ৬৮ ব্যাটিং।

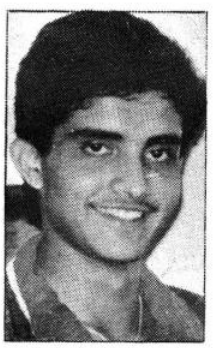

নিজের ব্যাটিং থেকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য অনেকটাই ছেঁটে ফেলে একদিকের উইকেট ধরে রাখছিলেন রাহুল। অন্যদিকে, ওয়ান্ডারার্সের ঘাসে শিস কেটে ছুটে যাচ্ছিল সৌরভের কভার ড্রাইভ। সৌরভ পেসটা খুব স্বচ্ছন্দে খেলছেন দেখে পল অ্যাডাম্সকে তাঁর পেছনে লাগাতে গেলেন ক্রোনিয়ে। সেই সফরে দক্ষিণ আফ্রিকা কোচ বব উলমার বলেছিলেন, অ্যাডাম্স দুনিয়ার 'এক নম্বর রিস্ট স্পিনার' হতে যাচ্ছেন। তা সেই অ্যাডাম্সের লেংথই সৌরভের সামনে পড়ে গণ্ডগোল হয়ে গেল। মিড উইকেটের ওপর দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে তাঁকে বিশাল একটা ছক্কা মারলেন সৌরভ। ৬৮ নট আউটের ইনিংসে ১২টা চার, একটা ছয়। ছ'টা বাউন্ডারি আবার অ্যাডাম্সকে। সৌরভের ব্যাটিং দেখতে-দেখতে প্রেসবক্সে আসা ক্লাইভ রাইস বলে ফেললেন, "এতদিন এই ব্যাটিংটা ছেলেটা করতে পারছিল না? এ তো দেখছি, জাত ব্যাট্সম্যান। এত ভাল অফের দিকে স্ট্রোক তো ব্রায়ান লারারও নেই।"

ব্রায়ান চার্ল্স লারার সঙ্গে তুলনার কথা পরেও বারবার শুনবেন সৌরভ। কিন্তু সেই প্রথম উঠে

অর্জুন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়নের সঙ্গে সৌরভ

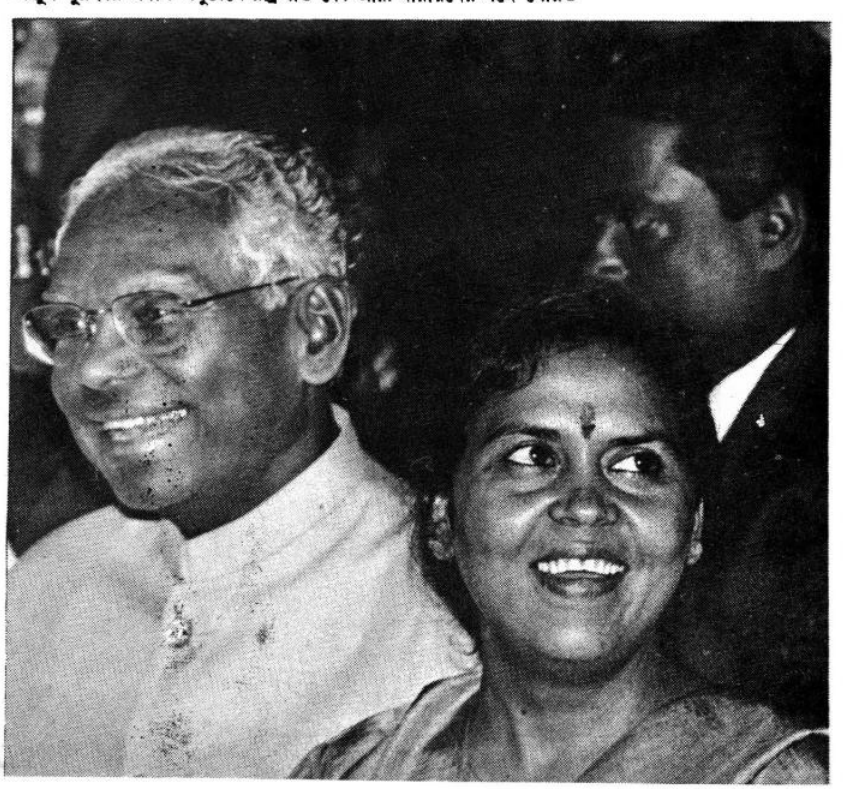

এসেছিল ওই তুলনা। আর সৌরভকে ও-কথা বলতেই বলেছিলেন, "বললেই হল? এসব তুলনার কথা এখন কেন শুনব আমি? কোনও দরকার নেই। আগের দুটো টেস্টে কিছু করতে পারিনি বলে এখানে অনেকেই মুখিয়ে আছে। রান না পেলেই ছিঁড়ে খাবে। আমি সেই সুযোগটাই দিতে চাইনি। এই টেস্টটায় ঠিক করেছিলাম অহেতুক ঠুকে খেলব না। অনেকক্ষণ ঠুকঠুক করে ১০ করে একটা ভাল বলে আউট হয়ে গেলে আপনারা ছেড়ে দিতেন? মারার বল পেয়েছি, মেরেছি।"

পরদিন সকালে লাঞ্চ ব্রুসনার সৌরভকে (৭৩) তুলে নিলেও নবম টেস্টে জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিটা পেলেন রাহুল। টেস্ট ব্যাটিং কীভাবে করতে হয়, কেন টেস্ট ব্যাট্সম্যানের কাছে ক্রিজকে ভালবাসা পৃথিবীর যে-কোনও বিষয়ের চেয়েও জরুরি, ওয়ান্ডারার্সে সেদিন বারবার তা বোঝাচ্ছিলেন কর্নাটকি যুবক। সৌরভের সঙ্গেই টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর। কিন্তু লর্ড্স আর ট্রেন্টব্রিজে সৌরভ যেখানে পরপর দুটো সেঞ্চুরি করে দেন, রাহুল সেখানে করেছিলেন ৯৫ আর ৮৪। ৯৯ আর ১০০-র মধ্যে তফাত যে ঠিক কতটা, ভবিষ্যতেও বারবার বুঝেছেন রাহুল। ওয়ান্ডারার্সে খেলা ইনিংসটাই এখনও তাঁর কাছে সবচেয়ে স্মরণীয় ইনিংস।

প্রথম ইনিংসে ভারতের ৪১০-এর উত্তরে দক্ষিণ আফ্রিকা করেছিল ৩২১। মেঘলা আবহাওয়ায় ১২ ওভার বল করার সুযোগে মাত্র ২৬ রান দিয়ে দুটো উইকেটও ছিল সৌরভের দখলে। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ইনিংসকে ম্যাচ জেতার মতো জায়গায় পৌঁছে দিলেন সেই সৌরভ আর রাহুলই। রাহুল

ফোটো জগদীশ যাদব

ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের হয়ে ইংল্যান্ডে খেলতে গিয়েছিলেন সৌরভ (ডান দিকে) ও শচীন

করলেন ৮১ আর সৌরভ ১১টা চার একটা ছক্কা সহ ৬০। ২৬৬-৮ অবস্থায় ভারত ডিক্লেয়ার করে দেওয়ার পর চতুর্থ দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা করল এক উইকেটে ৪ রান। ৩৫৬ করলে জেতা যাবে, হাতে একটা দিন।

স্মরণীয় একটা টেস্ট ম্যাচের শেষ দিনটা দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমরা। হতে পারে, বিদেশে ফের একটা টেস্ট জিততে যাচ্ছে ভারত। গোটা নয়ের দশকে বিদেশে ভারতের টেস্ট জয় মাত্র একটা। '৯৪-এর শ্রীলঙ্কা সফরে আজহারের টিম জিতেছিল দুর্বল রণতুঙ্গাদের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া আজহারের অধিনায়কত্বে বিদেশে ভারতের একটাও জয় নেই। ওয়ান্ডারার্সে পারবেন শচীন নয়ের দশকে বিদেশে ভারতের টেস্ট রেকর্ডটা একটু ভাল করতে?

সকাল থেকেই উইকেট আসছিল একের পর এক। স্কোরবোর্ডে দক্ষিণ আফ্রিকা ৭৬-৫, শচীনের বাহিনী উলমারের টিমের টুঁটি টিপে ধরেছিল। হঠাৎই আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি, গ্যালারিতে কাগজে লিখে কারা যেন তুলে ধরল 'গড ইজ আ সাউথ আফ্রিকান'। এর পরও নাটকের পর নাটক। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরও সেই টেস্টের দুই আম্পায়ার সিরিল মিচলি ও পিটার উইলি ম্যাচ শুরু করতে নিলেন অহেতুক ৪৫ মিনিট। ব্যাট্সম্যানদের যে-কোনও আবেদনে সাড়া দিয়ে বারবার মাঠে নিয়ে এলেন লাইটমিটার। টেস্ট বাঁচানোর জন্য যা-যা করা দরকার, সবই করছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ৯৫-৭ অবস্থা থেকে একদিক আটকে লড়াই করে যাচ্ছিলেন ডারিল কালিনানও। দক্ষিণ আফ্রিকা একটা সময় ২২৮-৮, তখনও নিয়ম অনুযায়ী চার ওভার বোলিং বাকি ভারতের। অর্থাৎ ২৪টা বল। জোরে বোলার দিয়ে বল করানো যাবে না আম্পায়ারদের এই দাবিতে শ্রীনাথ-প্রসাদকে সরিয়ে শুধু সৌরভ আর কুম্বলেকে বল দিলেন শচীন। তাতেও আবেদন। খারাপ আলোর। চার-চারটে ওভার

(এর পর ৩৮ পাতায়)

নিজের ব্যাটিং থেকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ছেঁটে ফেলে একদিকের উইকেট ধরে রাখছিলেন রাহুল। অন্যদিকে ওয়ান্ডারার্সের ঘাসে শিস কেটে ছুটে যাচ্ছিল সৌরভের কভার ড্রাইভ। সৌরভ পেসটা খুব সচ্ছন্দে খেলছেন দেখে পল অ্যাডাম্সকে তাঁর পেছনে লাগিয়ে দিলেন ক্রোনিয়ে।

অরণ্যদেব
ইদানীং নদীর ওপারে মাদক পাচারকারীদের দৌরাত্ম্যের খবর রাখেন?
হ্যাঁ। দুই অরণ্যরক্ষী নিহত। কিন্তু রহস্যের কোনও কিনারা পাচ্ছি না।
ওই চক্রের দুই পাণ্ডা। ড্র্যাক্স ও কুইন।
দারুণ ব্যাপার। ধরলেন কী করে?
উকিল চাই আমাদের।
তার ব্যবস্থা হচ্ছে।
এ দিয়ে নদীটা দেখা যায়, রাতেও। এর সাহায্যে ওরা নির্দেশ পাঠাত।
আচ্ছা কৌশল বটে। এজন্যই ওদের ধরতে পারছিলাম না।
ওয়াকারটন বার্তা
মাদক চোরাচালান চক্রের দুই পাণ্ডার যাবজ্জীবন প্যারোলে মুক্তির দাবি নাকচ।
কোটি-কোটি টাকার কারবার
ন্যায্য বিচার চেয়েছিলে, তা পেয়েছ তো?
মুখোশধারীর গলার শব্দ!
কে তুমি?
দুষ্টু লোকেরা জব্দ।
সুখি, তোমার জন্য একটা উপহার আছে। ওরা তোমার.....
..... ঘোড়াটাকে মেরে ফেলেছে। তার বদলে আর একটা।
নতুন ঘোড়া!
11-24
ওয়াকারের টেবিল থেকে বিদায়
এর পর : নতুন কাহিনী

অরণ্যদেব
তোমাদের বিদায় জানাতে এসেছি। কী হল এমন মনমরা কেন সুখি?
আবার এক সমস্যা। তোমাকে আর কত বিরক্ত করব।
সমস্যাটা নাতনি লুনাকে নিয়ে। আমার ছেলেই বলুক।
লুনা কার্ডোনা থেকে নিখোঁজ হয়েছে।
কার্ডোনা : নদীর দক্ষিণে অনেক দূরে এক মরু দেশ....
©1996 by King Features Syndicate, Inc. World rights reserved
কিছুটা আবার অনাবিষ্কৃত জঙ্গল। সেখানে নাকি অদ্ভুত জীবজন্তুর বাস
সে-দেশের শাসক নিষ্ঠুর এক স্বৈরতন্ত্রী নায়ক.....
12-1
বিদ্রোহীদের জন্য ফাঁসি বা কারাগার
আট কোটি বছর আগে সেখানে ঘুরত বিশাল জানোয়াররা.....
এখন মেলে পাথর হয়ে যাওয়া জীবাশ্ম। লুনার নেতৃত্বে একটি দল.....
এখানে কিছু আছে।
(ক্রমশ)

(৩৫ পাতার পর)

বাকি থাকতে হঠাৎই শেষ করে দেওয়া হল ম্যাচ। মাঠে শুরু হল কিছু শ্বেতাঙ্গের বিজাতীয় উল্লাস। গোটা সিরিজে 'আমরা পজিটিভ ক্রিকেট খেলি' বিজ্ঞাপনটা প্রচার করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা বোর্ড। সেই দাবি ওয়ান্ডারার্সে ধুলোয় গড়াগড়ি খেল। বর্ণবৈষম্যের পরবর্তী যুগে এর চেয়ে নেতিবাচক কিছু কী-ই বা দেখাতে পারতেন ক্রিকেট কর্তারা?

একটুর জন্য টেস্ট তো হাতছাড়া হলই, গোদের ওপরে বিষফোড়ার মতো হঠাৎ আম্পায়ার পিটার উইলি অভিযুক্ত করলেন সৌরভ আর পঙ্কজ ধর্মানিকে। ম্যাচ শেষ হতে না হতে ম্যাচ রেফারি ব্যারি জার্মনের কাছে গিয়ে উইলি অভিযোগ করেন, সৌরভ ও পঙ্কজ ধর্মানি অ্যাডাম ব্যাখারের বিরুদ্ধে একটা আবেদনে সাড়া না দেওয়ার জন্য তাঁর দিকে তেড়ে যান। উইলির রিপোর্টের ভিত্তিতে ডাকাও হল সৌরভদেরও। আর সেই রাতেই হোটেলের ঘরে টেনশনে ছটফট করতে-করতে সৌরভ বললেন, "লোকাল ম্যাচে দু'-একবার মাথা গরম করিনি, তা নয়। একবার তো সি এ বি সাসপেন্ডও করেছিল আমাকে। কিন্তু তা বলে সামান্য আবেদন করার জন্য এভাবে কমপ্লেন করল? আসলে এরা কিছুতেই এখানে আমাদের জিততে দেবে না— যেভাবে হোক, আটকাবে।"

স্লেজিং-এর যে নয়ারূপ বিশ্বক্রিকেটে অস্ট্রেলীয়রা আমদানি করেছেন, এতদিনে তার বিভিন্ন চেহারা ধরা পড়েছে সৌরভের কাছেও। লর্ডস্ টেস্টে যখন তিনি ৯০-এর ঘরে, অ্যালান মুলালি ক্রমাগত গালাগালি করে তাঁর মনঃসংযোগ ভাঙতে চেয়েছিলেন। জোহানেসবার্গ টেস্টেও একই চেষ্টা করেছিলেন অ্যালান ডোনাল্ড। ব্যাট করার সময় সৌরভকে কিছুই করা যায়নি, কিন্তু আম্পায়ার একবার আউট না দেওয়ার পর দু'বার আবেদন করে উইলির রোষে পড়ে গেলেন তিনি। পরদিনই ম্যাচ রেফারি ব্যারি জার্মন প্রেসকে ডেকে জানিয়ে দিলেন, মাঠে অভব্যতার জন্য সৌরভ ও ধর্মানির ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।

ওয়ান্ডারার্স থেকেই ছুটলাম স্যান্ডটন সান হোটেলে। কলকাতায় সৌরভের জরিমানার চেয়েও বড় খবর হবে, তাঁর প্রতিক্রিয়া। জীবনে প্রথমবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জরিমানা দিতে হচ্ছে, কী তাঁর অনুভূতি?

স্যান্ডটন সান হোটেলে পৌঁছেই চমক। সাদা ধবধবে পাঞ্জাবি-পায়জামা, গা থেকে ভুরভুর করে বেরোচ্ছে দামি সুগন্ধির গন্ধ। রুমে সি ডি প্লেয়ারে ভেসে আসছে সেই মুহূর্তের আন্তর্জাতিক হিট 'ও-ম্যা-কা-রি না'। রুমের দরজা খুলেই আমাকে অবাক করে দিয়ে সৌরভ বললেন, "আগে লাঞ্চ করে আসি। তারপর ওইসব জরিমানা-টরিমানা নিয়ে বসা যাবে।"

ততক্ষণে জেনে গিয়েছে দল হিসেবে সরকারিভাবে ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে চলেছে ভারত। জেনেছেন সৌরভও। হোটেলের ১২ তলায় একটা ভারতীয় রেস্তরাঁয় ঢুকে নান আর চিকেন কারির অর্ডার দিয়ে বললেন, "ঠিক কী হয়েছিল, সেটা সবার জানা উচিত। অ্যাডাম ব্যাখারের বিরুদ্ধে ক্যাচের 'অ্যাপিল' করেছিল ফরওয়ার্ড শর্ট লেগে দাঁড়ানো ধর্মানি। পয়েন্ট থেকে আমিও 'হাউজ দ্যাট' বলে চেঁচাই। দোষের মধ্যে সম্মিলিত চিৎকার থেমে যাওয়ার পর আমরা আরও একবার অ্যাপিল করি। বলা হচ্ছে, আমরা নাকি আম্পায়ারের দিকে তেড়ে গিয়েছি। টিভিতে তো ম্যাচটা অনেকেই দেখেছে। কেউ দেখাতে পারবে, আমরা আম্পায়ারের দিকে তেড়ে গিয়েছি?"

এর পরই একটু থেমে ফের বললেন, "কাল আমাদের তো জিততে দেওয়া হল না, শেষদিকে ম্যাচটা প্রহসন হয়ে যাচ্ছিল। প্রতিটা বলের পরে ওরা অ্যাপিল করছে, লাইটমিটার আসছে। এটা দোষের নয়, অথচ আমরা দু'বার অ্যাপিল করলাম বলে জরিমানা হয়ে গেল। শেষদিকে আমাদের জোরে বোলারদের বলই করতে দেওয়া হয়নি। আমি পর্যন্ত আম্পায়ারদের কথায় স্পিন করছিলাম, দক্ষিণ আফ্রিকা এরকম পরিস্থিতিতে থাকলে আর আমরা ব্যাট করলে এত লাইটমিটার আসত কি? চার ওভার আগে ম্যাচ শেষ হত?"

শচীন আর রাহুলের পরই টেস্ট সিরিজে ব্যাটিং গড়ে তিন নম্বরে ছিলেন সেবার। কিন্তু ইংল্যান্ডের পর টেস্ট সেঞ্চুরি আর নেই। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর সম্বন্ধে বলছিলেন, "দারুণ কিছুই করতে পারিনি এই সফরে। ইংল্যান্ড সফরের মতো বারবার দুটো হান্ড্রেড হয় না। কিন্তু শচীন আর রাহুলের ঠিক পরেই আছি আমি। এত দ্রুত উইকেটে প্রথমে যে অসুবিধেটা হচ্ছিল, সেটা মানিয়ে নিয়েছি। পেস বোলিং খেলার জন্য সবচেয়ে আগে দরকার, সাহস। আমি উদাহরণও

সকাল থেকেই উইকেট আসছিল একের পর এক। স্কোরবোর্ডে দক্ষিণ আফ্রিকা ৭৬-৫, শচীনের বাহিনী উলমারের টিমের টুঁটি টিপে ধরেছিল। হঠাৎই আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি, গ্যালারিতে কাগজে লিখে কারা যেন তুলে ধরল 'গড ইজ আ সাউথ আফ্রিকান'।

ইডেনের অনুশীলনে, শ্রীনাথের সঙ্গে ফোটো: দেবীপ্রসাদ সিংহ

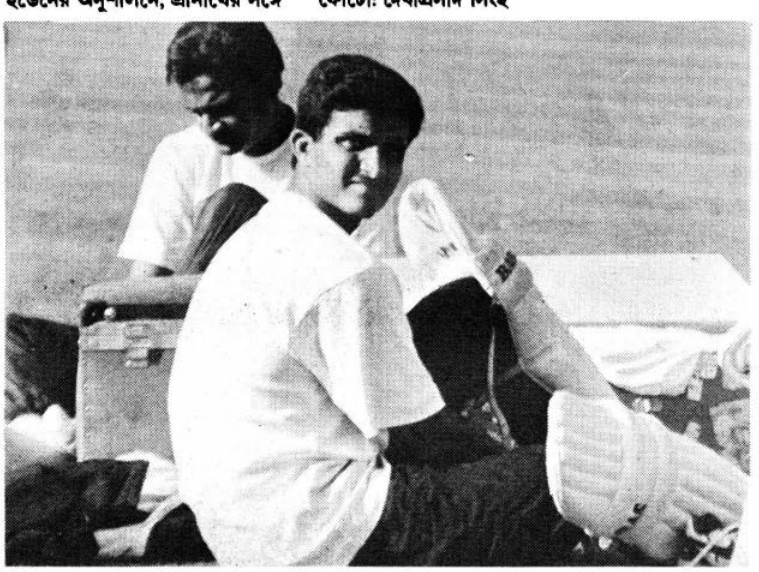

দিচ্ছি। ওয়ান্ডারার্সে দ্বিতীয় ইনিংসে ম্যাকমিলানের বল কাঁধে লাগল। আমি জায়গাটা ঘষিনি পর্যন্ত। আমি ম্যাকমিলানকে হাড়ে-হাড়ে চিনি। আমি জানি, জায়গাটা ঘষলেই ও আরও বাউন্সার দেবে। আমার লেগেছে, এটা ওকে বুঝতে দেওয়া যাবে না। কিছুতেই না। দেখলাম, আমার কিছু হয়নি দেখে ও একটা হাফভলি দিয়ে ফেলল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে টিকে যাওয়ার জন্য এটাও একটা রাস্তা—কার কতটা মনের জোর, এই পরীক্ষা বারবার দিতে হবে। প্রথম টেস্টের সময় 'হরাইজন্টাল স্ট্রোক' খেলতে কী অসুবিধে হচ্ছিল, অথচ এখন কাট, পুল, দুটোই ইচ্ছেমতো করতে পারছি।"

এর পরই ছিল একদিনের ম্যাচের ত্রিদেশীয় সিরিজ। সেই সিরিজে শচীনের সঙ্গে ওপেন করার কথা তাঁর। প্রসঙ্গটা তুলতেই বলেছিলেন, "টেস্ট ক্রিকেটটাই কিন্তু আসল ক্রিকেট। টেস্টে সফল হওয়ার গুরুত্বই আলাদা। একদিনের ম্যাচকে আমি ছোট করছি না, কিন্তু যে-কোনও ক্রিকেটারের কাছে আসল ক্রিকেট ওই টেস্ট ক্রিকেটই।"

টেস্ট সিরিজ 'কভার' করেই আমার কলকাতায় ফেরার কথা। ত্রিদেশীয় সিরিজের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে ফেরার আগে সৌরভ হঠাৎ বললেন, "একটা খবর কিন্তু তোমাকে দিতে পারি।" গোপনে 'রেজিস্ট্রি' বিয়ের খবর তিনি অস্বীকার করার পর ব্যর্থতার দায় আমাকেই নিতে হয়েছিল। সেজন্য মাঝে-মাঝে আফসোস হত না, এমন নয়। একটা খবর জেনেও না লিখতে পারার যন্ত্রণাটা রিপোর্টার ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। সৌরভের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, "খবরটা কী?"

সৌরভ লাজুক মুখ করে বললেন, "আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাদের, মানে আমার আর ডোনার বিয়ের তারিখটা পাকা হয়ে গেছে।"

খবরের গন্ধ ততক্ষণে চলে এসেছে। বললাম, "কবে? তারিখটা কী?"

"২১ ফেব্রুয়ারি। বিয়ে করেই ওয়েস্ট ইন্ডিজে যাব। ডোনাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।"

উত্তেজিত হয়ে বললাম, "ওয়েস্ট ইন্ডিজে মধুচন্দ্রিমা কাটাবেন সৌরভ। ব্যাপারটা কিন্তু কলকাতার যে-কোনও কাগজ লুফে নেবে। তা হলে লিখে দিই—"

এবার সৌরভ বললেন, "না না, এখান থেকে লিখো না—কলকাতায় গিয়ে লিখো—"

সৌরভের আনুষ্ঠানিক বিয়ের খবর প্রথম আনন্দবাজারেই বেরিয়েছিল। কিন্তু সেটা নয়, তার চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। দক্ষিণ আফ্রিকায় ত্রিদেশীয় সিরিজে ভারত ফাইনালে উঠলেও বারবার তাঁর কাছ থেকে প্রচারের আলো সরে গিয়ে পড়ছিল রাহুল দ্রাবিড়ের ওপর। ডারবানে

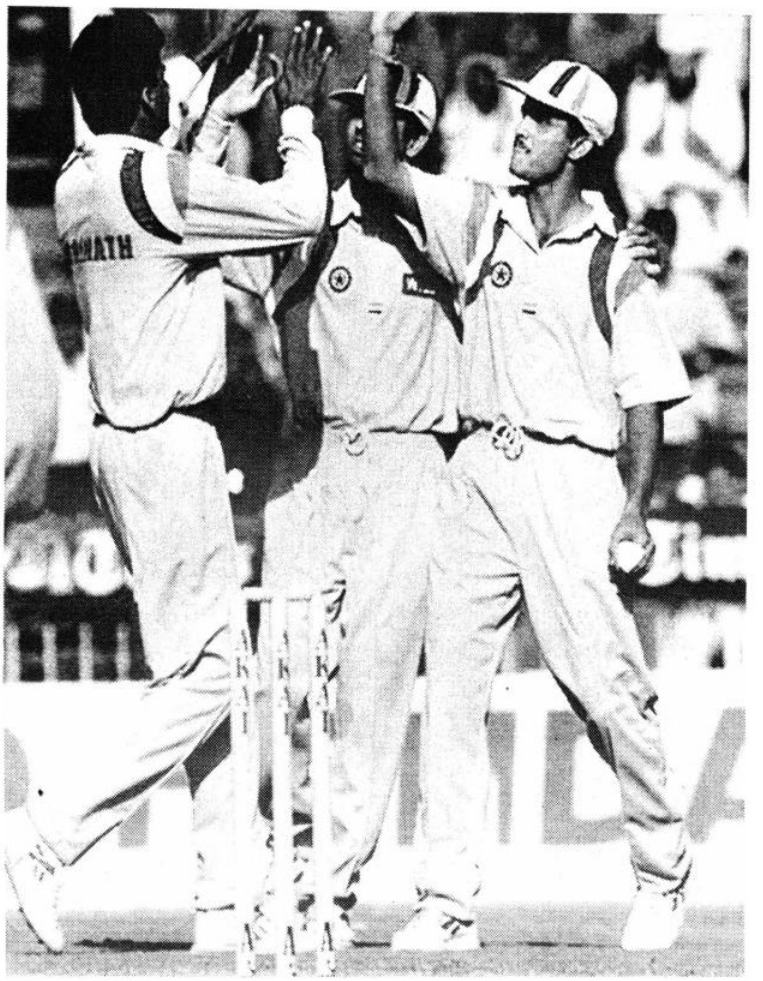

শারজায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ম্যাচের একটি মুহূর্ত

ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে ডোনাল্ডকে কভারের ওপর দিয়ে মারা ছক্কা সহ ৮৪ রানের অবিশ্বাস্য একটা ইনিংস খেলেছিলেন রাহুল। গোটা দেশ ফের ধরে নিচ্ছিল, ভারতীয় ক্রিকেট নয়ের দশকে নতুন যে দুই তরুণ উপহার দিয়েছে, তাদের মধ্যে একটু এগিয়ে আছেন রাহুলই। লম্বা রেসের ঘোড়া তাঁকেই বলা উচিত। অন্যদিকে, লর্ডস আর ট্রেন্টব্রিজে তৈরি করা জমি একটু-একটু করে হারাচ্ছিলেন সৌরভ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ যাওয়ার আগে অবশ্য একবারও মনে হয়নি, 'রাহুল সিনড্রোম' সামান্যতম চাপে রেখেছে সৌরভকে। যাওয়ার আগে একদিন বললেন, "ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডস। স্বপ্নের দেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজে না খেলা মানে ক্রিকেটার হিসেবেই জীবনটা অসম্পূর্ণ থাকা। দেখে নিয়ো, সফর-শেষে আমাকে নিয়ে ফের নতুন করে ভাবতে হবে।"

পরীক্ষা ছিল শচীনেরও। দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজে ০-২ হার, ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালেও হার। ওয়েস্ট ইন্ডিজে আগে কখনও যাননি তিনিও। অধিনায়ক হিসেবে চাপ নিতে পারছেন না, টিম বিপর্যস্ত, এই দাবি তখন উঠে গিয়েছে। এইরকম পরিস্থিতিতে পাঁচ টেস্ট ও তিনটে একদিনের ম্যাচের সিরিজ খেলতে ভারত উড়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

(ক্রমশ)

এর পরই ছিল একদিনের ম্যাচের ত্রিদেশীয় সিরিজ। সেই সিরিজে শচীনের সঙ্গে ওপেন করার কথা তাঁর। প্রসঙ্গটা তুলতেই বলেছিলেন, "টেস্ট ক্রিকেটই কিন্তু আসল ক্রিকেট। টেস্টে সফল হওয়ার গুরুত্বই আলাদা।"

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
মিঃ কোলম্যান, এক ঘন্টার মধ্যে আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন মিঃ র‍্যাভেজ
মিঃ স্টাউব, আপনার বস বেশ কাজের লোক।
এদিকে মিঃ কোলম্যান।
বাণিজ্যিক এক প্রস্তাব নিয়ে জে ইলিয়ট কোলম্যান এলেন মাইকেল র‍্যাভেজের পার্বত্য আবাসে.....
মিঃ র‍্যাভেজ, বলে রাখি, নাম গোপন রাখতে চান আমার মক্কেল। আপনার 'কাজের' জন্য এক কোটি ডলার দিতে রাজি।
মিঃ কোলম্যান, আপনার মক্কেল তো মাদক চক্রের লোক। নিহত জেনারেল নে হাং-এর মৃত্যুর বদলা নিতে চান।
তাই না? ...
... চা খাবেন?
না।
ভুল বলেছি আমি?
আপনার অভিযোগ স্বীকার করছি না, অস্বীকারও না।
বাদ দিন। নীতি নয়, টাকা নিয়েই মাথা ঘামাই আমি।
সুইস ব্যাঙ্কে এক কোটি ডলার জমা থাকবে। উদ্দিষ্ট লোকটিকে খতম করতে পারলে টাকাটা আপনার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। # কাকে মারতে হবে বুঝেছেন
বুঝেছি। যে নে হাং-কে মেরেছে তাকে। অর্থাৎ লর্ড গ্রেস্টোককে... যার অন্য নাম টারজান দ্য এপম্যান।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ভাঙা ডানার পাখি

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

চোদ্দ

সন্ধে পেরিয়ে রাত্রি নেমে গেছে অনেকক্ষণ। থেকে থেকে বাতাস বইছে একটা, বৈশাখ রাতের মিঠে বাতাস। কাছেপিঠের বাঁশঝাড়ে ঝিঁঝি ডেকে চলেছে অবিরাম, একটানা সুরে ঝমঝম করছে অন্ধকার। চাঁদ ওঠেনি এখনও, আকাশে শুধুই তারার মেলা। মালঞ্চ গ্রাম ক্রমে নিঝুম হয়ে এল।

অরুণাশ্ব নিজের দাওয়ায় বসে ছটফট করছিল। খিদেয়। জীবদত্তর বাড়িতে সন্ধে সন্ধে আহারপর্ব শেষ হয়ে যায়। বাড়ির লোকের খাওয়া চুকলে তবে ডাক পড়ে অরুণাশ্বর। আজ কোনও উচ্চবাচ্য নেই কেন? অরুণাশ্ব বলে যে একটা প্রাণী আছে সে-কথা কি ভুলেই গেলেন সেঁজুতির মা?

অভিমানে অরুণাশ্বর চোখে জল এসে গেল। প্রথম যেদিন এ বাড়িতে পা রেখেছিল সেদিনকার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তার খাওয়া দেখে মাথায় হাত দিয়েছিলেন সেঁজুতির মা। গজগজ করে বলেছিলেন, এতটা করে ভাত খাবে রোজ। লজ্জায় পরদিন থেকে খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে অরুণাশ্ব, পেট না ভরলেও দ্বিতীয়বার ভাত চায় না। জীবদত্তর স্ত্রী মুখের কথা খসানোর আগেই তাঁর হুকুম তামিল করে অরুণাশ্ব, প্রাণপণে তাঁর মন পাওয়ার চেষ্টা করে। তবু এই ভুল?

অরুণাশ্ব উঠে দাঁড়াল। ভেজা চোখে তাকাল জীবদত্তর বাড়ির দিকে। টুকটাক শব্দ শোনা যাচ্ছে, আলোও জ্বলছে। অর্থাৎ বাড়ির লোকজন এখনও ঘুমোয়নি। আশ্চর্য, সেঁজুতিও কি ভুলে গেল তার রোমথাদাদাকে এখনও খেতে দেওয়া হয়নি?

ঘরে টিমটিম প্রদীপ জ্বলছে। চাটাইয়ের শয্যায় এসে শুয়ে পড়ল অরুণাশ্ব। চোরা রাগ দপদপ করে উঠছে বুকে। গাধার খাটুনি সে খাটছে সারাদিন, তারপরও দু' মুঠো ভাতের জন্য এত হেনস্থা?

অরুণাশ্ব তড়াক করে আবার উঠে বসল। কটমট চোখে নিজের ঘরখানাকে দেখল একবার। অতি ছোট্ট ঘরখানা সম্পূর্ণ আসবাবহীন। একটা শুধু দড়ি ঝুলছে কাপড়,গামছা রাখার জন্য, আর এক কোণে জলের কলসি। হাত বাড়িয়ে কলসি টেনে মুখের কাছে ধরে ঢকঢক জল খেল অনেকটা। খিদে একটু কমল যেন। আবার শুতে গিয়েও চোখ পড়েছে ঘরের অন্য কোণে। সাত আটখানা ছোবড়া না ছাড়ানো নারকেল স্তূপ হয়ে আছে। কাল সকালে উঠে ছাড়িয়ে দিতে হবে। নারকেল দিয়ে কী যেন রাঁধবেন সেঁজুতির মা।

অদ্ভুত এক হাসি খেলে গেল অরুণাশ্বর ঠোঁটে। স্তূপের পাশে রাখা কাটারিটা হাতে তুলে নিয়েছে। প্রবল বিক্রমে নারকেল ছাড়ানো শুরু করে দিল। ঠকাঠক কাটারি চালাচ্ছে। ইচ্ছে করে। জোরে জোরে। যদি রাতদুপুরে বিদ্‌ঘুটে শব্দ শুনে অরুণাশ্বর কথা ওঁদের খেয়াল হয়।

দেখতে দেখতে অরুণাশ্ব ঘেমে নেয়ে গেল। তবু থামছে না, এক ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে হাত। দু'পায়ের মাঝে নারকেল রেখে হাতের চাপে ছাড়াচ্ছে ছোবড়া, আওয়াজ উঠছে চড়চড়। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে ঘাম মুছল কপালের। হঠাৎই ভীষণ চমকে উঠল। কী একটা ছায়া নড়ে গেল না দেওয়ালে? ভাবতেই শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত। এ গাঁয়ের সেই ভূতটা নয় তো?

দু-এক পল অরুণাশ্ব স্থির। তারপর খুব ধীরে-ধীরে ঘাড় ঘোরাচ্ছে। দেওয়াল পর্যন্ত চোখ ঘুরতেই বেদম হাসি পেয়ে গেল। ধুস্, ও তো নিজেরই ছায়া। তারই নড়াচড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠছে ছায়া, দুলছে।

আপন মনে বেশ খানিক হেসে নিল অরুণাশ্ব। কত সহজে মানুষ ভুল করে। কত সামান্য কারণে মানুষ ভয় পায়! অথচ একটু চোখ-কান সজাগ রাখলেই সব ভয় দূরে সরে যায়। এই ভূতের গল্পটা কাল বামুনঠাকুরের কাছে করতে হবে।

বৃকোদরের কথা মনে পড়তেই অরুণাশ্ব সামান্য উদাস। আজ বিকেলেও বামুনঠাকুর তাকে হরেক রকম প্রশ্ন করছিল। সেই পুরনো অপ্রিয় প্রসঙ্গ। আজ অবশ্য প্রশ্নের ধারা একটু অন্যরকম ছিল। তোমার ভাই যে খঞ্জরটি হারিয়ে ফেলেছিল, তুমি জানতে অরুণাশ্ব? তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তো তোমার সকাল-বিকেল সর্বক্ষণ দেখা হত, একবারও সে তোমায় বলেনি? অথচ সে তোমার কাকাকে বলেছে?

খঞ্জরটা থাকত কোন ঘরে? তোমার ভাইয়ের, না কাকার? ও, তোমার ভাই কাকা-কাকিমার ঘরেই থাকত! ওই খঞ্জর হারানো নিয়ে তোমাদের বাড়ির কাজের লোকদের কিছু বলেননি কাকা? তাদেরও কেউ তোমায় কিছু বলেনি কোনওদিন?

কাকাকেই কি সন্দেহ করছে বামুনঠাকুর? অরুণাশ্বর মনেও এ ধরনের একটা চিন্তা মাঝে-মাঝে উঁকি দেয় বটে। বিচার হয়ে যাওয়ার পর একটিবারের জন্যও কাকা অরুণাশ্বর সঙ্গে দেখা করতে এলেন না, এমনকী বিক্রমপুরের ঘাটেও না। কবিরাজমশাইয়ের কথা শুনেও মনে হয়নি কাকা তাঁর সঙ্গে কখনও দেখা করেছেন। অর্থাৎ তার বেঁচে থাকা মরে যাওয়া নিয়ে কাকা মোটেই ভাবিত নন। তা হলে বিচারকক্ষে তাঁর অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটা কি অভিনয়? বাবা অবশ্য মাঝে-মাঝে ঠাট্টা করে বলতেন নয়নাগ খুব ভাল অভিনয় করতে পারে ...

বাইরে কিসের যেন একটা শব্দ। কান খাড়া করল অরুণাশ্ব। উঠোনের মাঝখানে বাঁশের ডগায় পাখির খোপ করে দিয়েছে। রাতে প্রায়ই বেড়াল ঘোরাঘুরি করে, পাখি ঠিক টের পেয়ে যায়, ডানা ঝাপটায় খুব। আজও উপদ্রব শুরু হয়েছে নাকি? অথবা এও মনের ভুল, একটু আগে ভূতের মতো?

অরুণাশ্ব ঠাট্টাচ্ছলে গলাখাঁকারি দিল, "কে রে বাইরে? ব্রহ্মদত্যি নাকি?"

মিহি স্বর ভেসে এল, "না। আমি সেঁজুতি।"

মুহূর্তের জন্য চমকে উঠেও হেসে ফেলল অরুণাশ্ব, "যাক, এতক্ষণে আমার খাওয়ার কথা মনে পড়ল!"

সেঁজুতি দরজায় এসে দাঁড়াল। চকিতে একবার নিজেদের বাড়ির দিকটা দেখে নিয়েই ঢুকে এল ঘরে।

অরুণাশ্ব অবাক চোখে সেঁজুতির দিকে তাকাল, "কী হল? চলো, যাই খেতে।"

সেঁজুতি জোরে জোরে দু'দিকে মাথা নাড়ল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "তোমার আজ খাওয়া নেই রোমথাদাদা।"

"সে কী! কেন?"

"বাবার নির্দেশ।"

"কেন এরকম নির্দেশ? আমি কী দোষ করেছি? এই তো আমি নারকেলগুলোও অর্ধেক ছাড়িয়ে রেখেছি..."

সেঁজুতি উত্তর দিল না। একটুক্ষণ চুপ থেকে খপ করে অরুণাশ্বর হাত চেপে ধরেছে, "তোমার ভীষণ বিপদ রোমথাদাদা। তুমি এক্ষুনি পালাও।"

"বিপদ? আমার?" অরুণাশ্ব অবাক হতে গিয়েও হেসে ফেলল, "আমার আবার নতুন কী বিপদ হবে?"

"সে আমায় জিজ্ঞেস কোরো না। তুমি এক্ষুনি পালাও। এক্ষুনি।"

"কোথায় পালাব?"

"যেখানে খুশি। আর কখনও এখানে ফিরে এসো না।"

অরুণাশ্বর ভুরু কুঁচকে গেল। সেঁজুতি বাচ্চা মেয়ে বটে, কিন্তু তার কথাগুলো তো ঠিক ছেলেমানুষের মতো মনে হচ্ছে না!

গম্ভীর মুখে বলল, "কী হয়েছে খুলে বলো তো।"

"বললাম না, আমায় জিজ্ঞেস কোরো না। এক্ষুনি চলে যাও। এক্ষুনি।"

অরুণাশ্ব কড়া স্বরে বলল, "তোমায় বলতেই হবে।"

অরুণাশ্বর চোখের দিকে তাকাল সেঁজুতি। তারপরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, "বাবা সাপের বিষ জোগাড় করেছেন। তোমার শরীরে সেটা মিশিয়ে দেবেন।"

অরুণাশ্বর গলা থেকে আর্তনাদ ছিটকে এল, "কেন?"

"সাপের বিষের ওষুধ তৈরি করবেন বাবা। মাকে বলছিলেন।" সেঁজুতি আবার ফুঁপিয়ে উঠল, "ওষুধে কাজ না হলে তুমি মরে যাবে।"

অরুণাশ্বর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। ওষুধ-বিষুধ নিয়ে তার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে এ তো জানতই অরুণাশ্ব, তা বলে সাপের বিষ? এমন ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা কেন আগে মাথায় আসেনি? মহারাজ বল্লাল সেন অবশ্য বলেছিলেন, তোমার জীবনটাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের গবেষণার জন্য উৎসর্গ করে দেওয়া হল। কবিরাজ জীবদত্ত এখন তোমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারেন। তুমি মরে গেলেও ...।

কিন্তু মৃত্যুর কথা শোনা এক, আর মৃত্যুর বিভীষিকা ঘাড়ের কাছে ফোঁস ফোঁস করা আর এক। দুই অনুভূতির মধ্যে কোনও তুলনা চলে না।

বিড়বিড় করে অরুণাশ্ব বলল, "তা হলে মরেই যাব?"

"কেন মরবে? পালাও।"

অরুণাশ্ব ম্লান হাসল, "আমার পালানোর উপায় নেই সেঁজুতি। আমার কপালের লিখন আবার আমায় ফিরিয়ে আনবে। আমি ধরা পড়ে যাব।"

"বনজঙ্গলে চলে যাও। কিংবা অন্য দেশে। দূরে, অনেক দূরে।"

মুহূর্তের জন্য বিচলিত হয়ে পড়ল অরুণাশ্ব। পা দুটো চঞ্চল হয়ে উঠছে। যাবে পালিয়ে? যা থাকে কপালে? পাটলিপুত্র চলে যাবে? কিংবা উজ্জয়িনী? কিংবা বিজয়নগর? সে দেশে বল্লাল সেনের হুকুম চলবে না, কেউ তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

পরক্ষণেই অরুণাশ্ব থমকাল। মনে পড়ে গেল ভিক্ষু সুভদ্রর কথা। দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "তা হয় না সেঁজুতি। এ এক ধরনের প্রতারণা। আমি তোমাদের আশ্রিত। আশ্রয়দাতাকে প্রতারণা করাটা অপরাধ। বৈদ্যমশাই ক'দিনের জন্য হলেও আমায় মুক্ত জীবনের স্বাদ দিয়েছিলেন। তাঁকে আমি ঠকাতে পারব না।"

"ঠকানোর কী আছে?" সেঁজুতি ফস করে বলে উঠল, "প্রাণে বাঁচার চিন্তা করাতে কোনও দোষ নেই।"

অরুণাশ্ব মনে মনে বলল, "আমার প্রাণটাই তো রয়েছে তোমার বাবার জন্যে।" মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "এখানেই বা প্রাণে বাঁচব না ধরে নিচ্ছ কেন? হয়তো তোমার বাবার ওষুধে....."

"অসম্ভব। কী সাঙ্ঘাতিক সাপের বিষ তোমায় দেওয়া হবে তুমি জানো না রোমথাদাদা।"

" জানতে চাইও না। তুমি ঘরে যাও। এত রাতে তুমি বেরিয়ে এসেছ দেখলে তোমার মা রাগ করবেন।"

"মোটেই না। মা'ই তো আমাকে পাঠালেন। আমি ঘরে বসে বসে কাঁদছিলাম, মা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন তোর রোমথাদাদাকে এক্ষুনি পালাতে বল।"

এই মুহূর্তে ঘরে বাজ পড়লেও বুঝি এত স্তম্ভিত হত না অরুণাশ্ব। মানুষকে সে কত কম চেনে! আপাতদৃষ্টিতে যাঁকে নিষ্ঠুর মনে হয়, তাঁর মধ্যেও কত করুণা লুকিয়ে থাকে! ভিক্ষু সুভদ্র ঠিকই বলেছিলেন। জীবনের কঠিন পরীক্ষায় নামার সুযোগ পেয়েছে সে। তাকে মন শক্ত করতেই হবে। জেনেশুনে জীবদত্তর মনে সে আঘাত দিতে পারে না।

(এর পর ৪৫ পাতায়)

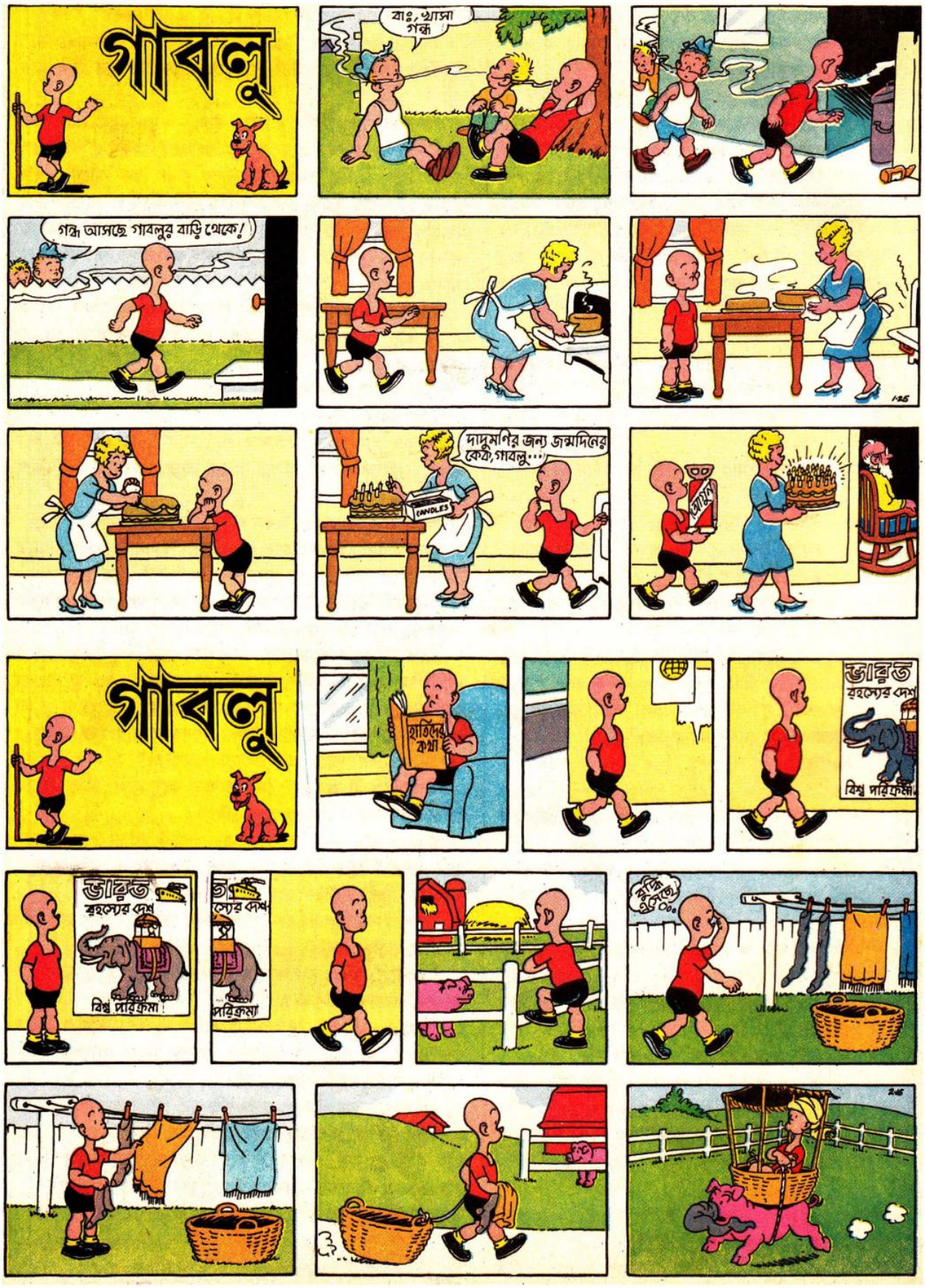

গাবলু
বাঃ, খাসা গন্ধ
গন্ধ আসছে গাবলুর বাড়ি থেকে!
দাদুমণির জন্য জন্মদিনের কেক, গাবলু...
CANDLES
1-25

গাবলু
হাতিদের কথা
ভারত
রহস্যের দেশ
বিশ্ব পরিক্রমা
ভারত
রহস্যের দেশ
বিশ্ব পরিক্রমা
বুদ্ধি এসেছে!

(৪৩ পাতার পর)

সেঁজুতি আবার মিনতির সুরে বলল, "তুমি যাবে না রোমথাদাদা? .... যাও না, লক্ষ্মীটি।"

অরুণাশ্ব মুখ ঘুরিয়ে নিল।

রাত্রির শেষ যাম। মিশমিশে অন্ধকারে ডুবে আছে পৃথিবী। রাতচরা পাখিরাও বুঝি এখন ডাকতে ভুলে গেছে। নিস্তব্ধতা ছিঁড়ে জঙ্গলের দিক থেকে শেয়াল ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পর পর অনেক শেয়াল ডাকছে। তারা থামতেই আবার সব নিঝুম।

তখনই অরুণাশ্ব গলাটা শুনতে পেল, "অরুণাশ্ব ওঠো। দরজা খোলো।"

অরুণাশ্ব উঠে আগল খুলে দিল, "আসুন।"

"তুমি জেগে আছ অরুণাশ্ব? ঘুমোওনি?"

অরুণাশ্ব সোজাসুজি জীবদত্তর মুখের দিকে তাকাল, "আমি প্রস্তুত আছি বৈদ্যমশাই।"

পলকের জন্য ইতস্তত করে ভেতরে এলেন জীবদত্ত। প্রায় নিভন্ত প্রদীপের সামনে গিয়ে বসলেন। হাতে তাঁর অনেক জিনিস। পাত্র রয়েছে দুটো-তিনটে, দড়ি রয়েছে, শলাকা রয়েছে....। একটি পাত্র থেকে সামান্য তেল ঢাললেন প্রদীপে। সলতে উস্‌কে দিলেন। আলো উজ্জ্বল হল। সেই আলোতে অরুণাশ্ব স্পষ্ট দেখতে পেল জীবদত্তর দু'চোখ টকটকে লাল। সারারাত ধরে কি ওষুধ তৈরি করছিলেন বৈদ্যমশাই?

অরুণাশ্ব মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল, "আমাকে এখন কী করতে হবে?"

"তুমি জানো আমি কীজন্য এসেছি?"

অরুণাশ্ব উত্তর দিল না। আলগা হাসল।

জীবদত্ত কী যেন ভাবছেন। আনমনে নাড়াচাড়া করছেন পাত্রগুলোকে। খানিক সময় নিয়ে বললেন, "তুমি আমাকে ভুল বুঝো না অরুণাশ্ব। আমি সজ্ঞানে তোমার ক্ষতি চাই না। আমি শুধু আমার ধর্ম পালন করছি।"

"আজ্ঞে আমি জানি।"

"তোমায় তখন সেঁজুতি এসে কিছু খাবার খাইয়ে যায়নি তো?"

অরুণাশ্ব নাড়া খেয়ে গেল। জীবদত্ত তা হলে জানেন সেঁজুতি এসেছিল? জীবদত্তও কি চেয়েছিলেন অরুণাশ্ব পালিয়ে যাক?

শান্ত গলায় অরুণাশ্ব বলল, "না বৈদ্যমশাই। সন্ধের পর থেকে আমি কিছুই খাইনি।"

"এবার তা হলে শুয়ে পড়ো।"

অরুণাশ্ব শুয়ে পড়ল। তার ডান বাহুটি আলোর দিকে টেনে নিলেন জীবদত্ত। আবেগহীন গলায় বললেন, "আশা করি আমার ওষুধ সার্থক হবে। যদি না হয়, যদি মারা যাও, মৃত্যুর আগে আমায় ক্ষমা করে দিয়ো।"

অরুণাশ্ব চোখ বুজল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টের পেল তীক্ষ্ণ শলাকাটা ঢুকে গেছে তার কব্‌জিতে। শলাকাটা ঘুরছে, কী যেন এক ঠাণ্ডা তরল প্রবেশ করছে শরীরে। ভীষণ জ্বালা করে উঠল জায়গাটা। যেন কোটি কোটি পিঁপড়ে একসঙ্গে কামড় বসাচ্ছে।

হঠাৎ অরুণাশ্ব চিৎকার করে বলতে চাইল, "আমাকে মারবেন না বৈদ্যমশাই। আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।"

কোনও স্বরই ফুটল না গলায়। চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ঘুম নামছে চোখে। মরণ ঘুম।

(ক্রমশ)

শব্দসন্ধান

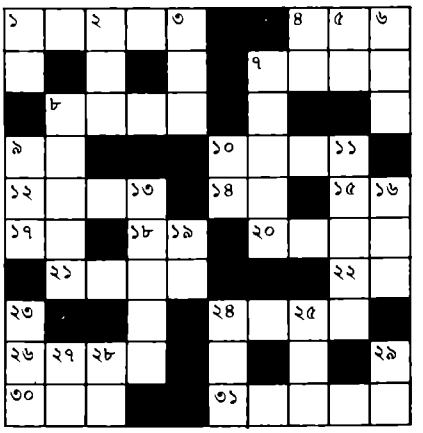

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) অকর্মণ্য, নিষ্ক্রিয়। (৪) ঈশ্বর। (৭) বিরামহীন। (৮) —বকবক করেও বক্তা অক্লান্ত। (৯) এটি টানলে মাথা আসে। (১০) 'ওগো কর্ণধার, তোমারে করি— ।' (১২) শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি। (১৪) '—প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।' (১৫) খরচের বিপরীত। (১৭) যার মধ্যে নারায়ণ বিরাজ করেন। (১৮) কাপড়ের ছেঁড়া অংশ সুচসুতো দিয়ে বুনে মেরামত। (২০) ননি। (২১) তপস্যার শক্তি। (২২) —কলম মন লেখে তিনজন। (২৪) খাটনির ফলে অতিশয় ক্লান্ত। (২৬) নদীর স্রোত নিত্য— । (৩০) বর্ষার পরের ঋতু। (৩১) মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা করার প্রতিজ্ঞা।

উপর-নীচ : (১) 'বালকবীরের বেশে তুমি করলে বিশ্ব— '। (২) গৃহ। (৩) চাউল। (৪) প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকলেও তিনি পটের— ছিলেন না। (৫) যা করলে শোধ দেওয়ার কথা মনে রাখতে হয়। (৬) তপ্ত। (৭) অননুমোদন। (৮) বাচালের স্বভাব— কথা বলা। (৯) বাগান। (১০) — বাবু ভব্য বেশি। (১১) একজন বিখ্যাত কবি-গীতিকারের নাম। (১৩) ইতিহাস —শীল। (১৬) ইন্দ্রের সারথি। (১৯) যা দিয়ে মালা গাঁথা। (২৩) হিমালয়ের প্রচন্ড শীতে হাত-পা যা হয়ে যায়। (২৪) কোকিল এই স্বরেই গায়। (২৫) যে-মাসে প্রবল বৃষ্টি হয়। (২৭) শিব। (২৮) জয়। (২৯) বাণ রাখার আধার।

গত সংখ্যার সমাধান

দেবসেনাপতি

সম্পূর্ণ উপন্যাস

বিশ্বাসঘাতক দুধনাথ

সুপ্রিয় ঠাকুর

প্র থ মাং শ

সেলুলার জেল

সেদিন বুধবার। শান্তিনিকেতনে তো রবিবার ছুটি নয়, বুধবার ছুটি। সকাল থেকে বুড়োর মন উসখুস করছে। বাজু আর বুড়ো ঠিক করেছে যে, দু'জনে ছুটির দিনটা বেশ মজা করে কাটাবে। ক্যানালের ধার ধরে সোনাঝুরি বন পেরিয়ে কিছুটা এগোলে এক দারুণ জায়গা পাওয়া যায়। ক্যানাল থেকে একটা শাখা বেরিয়ে সাঁকোর নীচ দিয়ে অনেক তলায় নেমে গিয়েছে। বেশির ভাগ সময়েই এই শাখা-ক্যানালটা একেবারে শুকনো থাকে। কিন্তু মাঝে-মাঝে যখন জল যায় তখন ওখানকার খোয়াই কেটে কত না আশ্চর্য আকৃতি তৈরি করে। কোথাও উঁচু ঢিবি, কোথাও বা গর্ত, দেওয়ালে সব অদ্ভুত গুহা, আরও কত কী ! ঢিবির ওপরে হয়ে থাকে বেঁটে-বেঁটে ছবির মতো গাছ, কিংবা ধারের দেওয়াল থেকে মাটির সমান্তরালভাবে কোনও গাছ বাড়ছে, কোথাও দুটো গাছের ডাল জড়িয়ে নালা পার হওয়ার ব্যবস্থা আপনা থেকেই হয়ে গেছে। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের ছবি যে দেখা যায়, এ যেন তারই একটা খুদে নমুনা এখানে তৈরি হয়েছে। দিদা এই জায়গাটাকে মিনি ক্যানিয়ন বলেন। মাঝে-মাঝে অনেক টুরিস্ট এখানে ভিড় করে, তখন খুব রাগ ধরে। নিরিবিলি থাকলে দারুণ অ্যাডভেঞ্চার জমে। আজকে অ্যাডভেঞ্চার এই মিনি ক্যানিয়নে। কোনওমতে সকালের খাবারটা মুখে গুঁজে "মা চললাম" বলে এক হাঁক মেরে বুড়ো তার সবুজ রঙের রেসিং সাইকেলে হেলতেদুলতে বাজুর বাড়ির দিকে চলল।

বাজুদের বাড়ির গেটে পৌঁছে বুড়োর উৎসাহে যেন কিছুটা ভাটা পড়ল। সে স্বভাবত বেশ লাজুক। বড়দের দেখলেই যেন সে কিছুটা গুটিয়ে যায়, তার যত সব আস্ফালন হয় তার সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে, নয় তার মায়ের সঙ্গে। বড়দের এড়িয়ে তো বাজুকে বাড়ি থেকে বের করা যাবে না।

"বাজু," বলে গেট থেকে একটা হাঁক দিল বুড়ো। কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, ভেতরের দরজাটা যেমন বন্ধ ছিল তেমনই রইল। একবার ভাবল ফিরে যাবে, তারপর মনে হল ওরই তো বাজুকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার কথা। সাহস করে গেটটা খুলে ফেলল। সাইকেলটা ঢুকিয়ে গেটটা বন্ধ করে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছল। সাইকেলটা স্ট্যান্ডে লাগিয়ে তিনটে সিঁড়ি পার হয়ে, দরজার কাছে পৌঁছে কোনওমতে ডোর্-বেলের বোতামটা টিপে দিল। হাতের তেলোটা ঠাণ্ডার মধ্যেও বেশ ঘামে ভিজে উঠল।

দরজাটা খুলে গেল। রাতের কাপড়ের ওপর একটা সোয়েটার চাপিয়ে

বাজু বাইরে এসে দাঁড়াল।

"কী রে, এখনও তৈরি হতে পারিসনি, যাবি না?"

একগাল হেসে বাজু বলল, "কাল রাতে বাচ্চুমামা এসে হাজির হয়েছে।"

ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বুড়ো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, "তা হলে আমি চলি।"

বাজু এক লাফে নেমে এসে বুড়োর হাতটা চেপে ধরে বলল, "আরে যাবি কোথায়? বাচ্চুমামাকে তো তুই চিনিস।"

উত্তরের অপেক্ষা না করে বুড়োকে টানতে টানতে বাজু ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

এর আগে বাচ্চুমামার সঙ্গে বুড়োর বেশ ক'বার দেখা হয়েছে এই বাড়িতে। তাঁর মুখে গল্প শুনতে সে ভালই বাসে। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারটা হল না বলে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তা ছাড়া বড়দের সে একটু এড়িয়েই চলে।

সামনের বসবার জায়গাটা পেরিয়ে, লম্বা ঘরটার এককোণে আরাম চেয়ারটাতে চাদর মুড়ি দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বাচ্চুমামা গরম চায়ের মগে চুমুক দিচ্ছেন— আর মাঝে-মাঝে বিড়িতে টান দিচ্ছেন।

"কী রে বুড়ো, কেমন আছিস?" ভারী অথচ একটু ভাঙা গলায় বাচ্চুমামা জিজ্ঞেস করলেন, "ভাল"; কোনওমতে উত্তর দিয়ে বুড়ো ঘরের মেঝেতে কী যেন খুঁজতে লাগল।

বাচ্চুমামা মানুষটি বেশ অদ্ভুত। কোথায় যে ওঁর বাড়ি, কী কাজ করেন, ওঁর আত্মীয়স্বজন কারা অথবা কেউ আছে কি না সেসব স্পষ্ট বোঝা যায় না। বাচ্চুমামা বাজুর ঠিক মামা নন। বছর-দুই আগে উত্তর বঙ্গের চা-বাগানে ছুটি কাটাতে গিয়ে বাজুরা বাচ্চুমামাকে আবিষ্কার করে। তখন তিনি হিমালয়ের এমন একটা জায়গা থেকে ফিরছিলেন যেখানে শহুরে মানুষরা বিশেষ কেউ যায় না। সেখানকার অদ্ভুত সব গল্প শুনে বাজু বাচ্চুমামাকে আর ছাড়তে চায় না। অগত্যা চা-বাগান থেকে বাচ্চুমামাকে বাজুদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এসে বাজুদের বাড়িতে দু'দিন কাটিয়ে যেতে হল। তারপর থেকেই আট-ন' মাস পরে, আবার কখনও-বা বছর পার করে বাচ্চুমামা হঠাৎ শান্তিনিকেতনে এসে হাজির হন। সঙ্গে থাকে একটা বড়সড় ক্যানভাসের ব্যাগ আর কাঁধে ঝোলে কাপড়ের থলি, যার মুখটা বোতাম দিয়ে বন্ধ। এই তাঁর সম্বল— তার মধ্যে বাচ্চুমামার যাবতীয় জিনিস।

এসে কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার পরই তাঁর নানা দেশ ঘোরার অভিজ্ঞতার

গল্প ফেঁদে বসেন। বাজু আর বাচ্চুমামার পাশ ছেড়ে নড়তে পারে না। তার ওপর দু-একটি পাড়ার বন্ধু যদি জুটে যায় তা হলে তো আর কথাই নেই। তখন সবাই মিলে হয় পাহাড়ের কোলে পাখিদের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার কথা অথবা কোনও মরুভূমিতে অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে পথ হারানো, কিংবা হিমালয়ের কোনও গুহায় সন্ন্যাসীর সঙ্গে রাত কাটানো চলতে থাকে। বাজুর মা কড়াইশুঁটি দিয়ে মুড়ি মেখে সামনে নামিয়ে দিয়ে যান। আর বাচ্চুমামার হাতে গরম চায়ের মগ! বাজুদের কাছে এই দিনগুলো একেবারে স্বর্গ। দশমিকের উলটোপালটা প্রশ্ন বা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার-এ 'ভার্ব'-এর শেষে 'এস' লাগানো, এসব কিছুই আর ভয় দেখাতে পারে না।

বাজুর মা-বাবাও বাচ্চুমামাকে বেশ পছন্দই করেন। তবে যখন দু-তিন দিন ধরে ছেলের লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ঘুচে যায়, নাওয়া-খাওয়ার নিয়মগুলো সব ওলটপালট হতে থাকে, তখন কিছুটা অস্বস্তি এড়ানো সম্ভব হয় না। বাচ্চুমামা অবশ্য দিনতিনেকের বেশি একটা জায়গায় টিকতে পারেন না। তাই এ অবস্থা বেশিদিন চলে না।

বাচ্চুমামা যখন এ-বাড়িতে থাকেন তখন ঘরের কোনার আরাম চেয়ারটা সবসময়ে তাঁরই দখলে থাকে। সামনে বাজু, বুড়োরা মোড়া নিয়ে ঘিরে বসে। জগৎ ভুলে তখন গল্প চলে, আর মাঝে-মাঝে কড়াইশুঁটি মুড়ি। আর বাচ্চুমামার চা ও বিড়িতে টান। এই ফাঁকগুলোতে হঠাৎ কখনও-কখনও বাচ্চুমামা কেমন জানি অন্যমনস্ক হয়ে চোখ বুজে চুপ করে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকেন। মাঝে-মাঝে বিড়িতে টান না দিলে হয়তো মনে হত, উনি ঘুমিয়েই পড়েছেন। রোগা অথচ শক্তিশালী লম্বাটে গড়ন, গায়ের রং রোদে পোড়া, কোঁকড়া কালো-সাদা চুল, বেশ ঘন ভুরুর তলায় বড় বড় চোখ, পাতলা ঠোঁটের ওপর অযত্নের গোঁফ, আর খাড়া নাকটা মুখের বেশ কিছুটা স্থান অধিকার করে আছে, বাজুর দেখতে খুব ভাল লাগে। ওঁর বয়স যে কত তা আন্দাজ করা শক্ত। গালের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে অথচ স্বাস্থ্যটা ভাল। ষাটও হতে পারে, আবার সাতাত্তরও হতে পারে।

"এবার কোথা থেকে ঘুরে এলে বাচ্চুমামা?" বাজু জিজ্ঞেস করল, যাতে গল্প শুরু হতে আর দেরি না হয়।

"আন্দামান, নিকোবরের নাম শুনেছ?" বাচ্চুমামা ফিরে প্রশ্ন করলেন। বাজু, বুড়ো দু'জনেই নাম দুটোর সঙ্গে পরিচিত, "বাঃ, তা শুনব না? ওইখানেই তো আসামিদের দ্বীপান্তরে পাঠানো হত।" উত্তরটা এল বাজুর কাছ থেকেই, কেননা বুড়োর লজ্জা কাটিয়ে স্বাভাবিক হতে আর কিছুটা সময় লাগবে।

"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ, বঙ্গোপসাগরে এই দ্বীপপুঞ্জ যেমন সুন্দর আবার তেমনই দুঃখের।" বাচ্চুমামার গলাটা একটু যেন কেমন একটা হয়ে গেল। বাজু, বুড়ো দু'জনেই শুনেছে যে, এই দ্বীপগুলি অতি সুন্দর—কিন্তু দুঃখের কেন হবে, এটা তাদের মাথায় ঢুকল না।

বিড়িটাতে শেষ টানটা দিয়ে ছাইদানির জমে ওঠা ছাইয়ের গাদায় ওটাকে কবর দিয়ে বাচ্চুমামা একটু নড়েচড়ে বসলেন। গায়ের চাদরটা ভাল করে গায়ে টেনে নিয়ে তিনি এইবারে যেন যাত্রা শুরু করলেন।

"কলকাতা থেকে এরোপ্লেনে যদি যাও তো ঘণ্টা দুইয়ে পোর্টব্লেয়ার পৌঁছে যাবে। আর জাহাজে গেলে দিন তিনেক। আমি যতবারই গেছি, জাহাজেই গেছি। সমুদ্রের চমৎকার দৃশ্য দেখতে দেখতে, ভালমন্দ খাবার খেতে খেতে যাওয়াটা আমার বেশ ভালই লাগে।"

"ওখানে অনেকবার গিয়েছ নাকি?" প্রশ্ন করে বাজু। বুড়োর দৃষ্টিটাও মেঝে ছেড়ে বাচ্চুমামার মুখে উঠে এসেছে।

"তা বেশ ক'বার, আগে তো প্রায়ই যেতাম। বহু বছর পর আমার সেই বহু পরিচিত জায়গা এই বৃদ্ধ বয়সে আর একবার দেখে এলাম। আর যাব না। আন্দামান এতই বদলে যাচ্ছে যে, আর যেতে ইচ্ছে করে না।

"বহু বছর আগে যখন প্রথমবার যাই তখন পোর্টব্লেয়ার শহরে ছিলাম, হোটেলে ভাল খাবার খেয়ে, সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। সেলুলার জেল আর টুরিস্টদের দেখাবার জন্য যেসব জায়গা আছে সেসবও দেখেছিলাম।"

"সেলুলার জেল কী?" বুড়োর গলা প্রথম শোনা গেল।

"ওই জায়গাটা হল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রথম দুঃখের জায়গা।" বাচ্চুমামা বলে চললেন। তাঁর মুখটা কেমন গম্ভীর দেখাল, স্বর আরও খাদে নেমে গেল। "সেল কথাটার মানে হল জেলখানার ছোট্ট খুপরি ঘর। সেলুলার জেলখানায় দ্বীপান্তরের কয়েদিদের রাখা হত। ছোট ছোট ঘর, নড়াচড়ার বিশেষ জায়গা নেই। জানলা নেই যে প্রকৃতির দৃশ্য দেখে মনটা একটু ভাল করা যায়। দেওয়ালের একেবারে উঁচুর দিকে গরাদে দেওয়া ছোট্ট ঘুলঘুলি। সারাজীবন ওই ছোট ঘরে সাদা দেওয়ালগুলি দেখে একা বসে থেকে কত মানুষ পাগল হয়ে গেছে। অসুস্থ হয়ে কত লোক মারা গেছে।

"কত বছর আগে দেখা, তবু স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। একদল টুরিস্টের সঙ্গে উপত্যকার এক হোটেল থেকে ঢালু টিলার গা বেয়ে এই সেলুলার জেল দেখবার জন্য ধীরে ধীরে উঠছিলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম যে, এই জেলখানা তো আমাদের তীর্থস্থান। এই জেলের ছোট ছোট ঘরগুলিতে যারা বছরের পর বছর তিলে তিলে মরেছে, তারা তো আমাদের প্রণম্য।

"এই জেলে যাদের পাঠানো হত, তারা সবাই খুনি আসামি নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই বিপ্লবী, যাঁরা ইংরেজের হাত থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের পথ বেছে নিয়ে কয়েদি হিসেবে ধরা পড়েছিলেন। এঁদের অনেকের প্রাণ দিয়ে গড়ে তোলা স্বাধীন দেশে আজ আমরা বাস করছি। খুনি আসামিরাও যে এখানে ছিল না তা নয়। তবে বিপ্লবীদের সংখ্যা এক সময়ে বেশ বেশিই ছিল।

"ভাবতে ভাবতে সেই সেলুলার জেলে পৌঁছে গেলাম। গত শতাব্দীর শেষের দিকে তৈরি লোহার বড় গেটটা তখনও বেশ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভেতরে ঢুকতে বেশ গা ছমছম করছিল।

"মাঝখানে টাওয়ার, তার থেকে সাতদিকে সাতটা দাড়ার মতো ঘরের সারি বেরিয়ে গেছে। তার বেশ কিছু তখন ভেঙে পড়েছে।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন জাপানিরা এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে বসেছিল তখন এই কয়েদখানার অনেকটাই তারা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

"কয়েদিদের এই জেল থেকে পালানোর উপায় ছিল না। পাহারাদারদের চোখ এড়িয়ে কোনওমতে বেরিয়ে এলেও, দ্বীপটি চারদিকে সমুদ্রে ঘেরা, সে সমুদ্র তো পার হওয়া যাবে না। দ্বীপের মধ্যে জঙ্গলে ঢুকলে হয় না খেতে পেয়ে প্রাণ যাবে, নয় সেই দ্বীপের আদিবাসীদের তীর খেয়ে মারা পড়তে হবে।

"গাইড সেলুলার জেলের ইতিহাস আওড়ে চলেছিলেন, '১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর যাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তাদেরই প্রথম আন্দামানে পাঠানো হয়। তারপর থেকে পরপর কত না বিপ্লবীদের এখানে পাঠানো হয়েছে। ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমা মামলায় যেসব বাঙালি ধরা পড়েছিলেন তাঁদেরও আন্দামানে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়েছিল। বারীন ঘোষ, উপেন ব্যানার্জি, উল্লাসকর দত্ত, আর কত সব সাহসী বাঙালি এই জেলে বন্দি ছিলেন।'"

"আলিপুর বোমার মামলা কী?" রাজু বড় বড় চোখে বিস্ময়ভরে

জিজ্ঞেস করে।

"ক্ষুদিরাম তখন ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়ে কেনেডি দম্পতিকে ভুল করে হত্যা করে ধরা পড়েছেন ও তাঁর ফাঁসি হয়েছে। বারীন ঘোষের দল বিপ্লবের কাজে বোমা বানাতে গিয়ে ধরা পড়লেন। আলিপুরে তাঁদের বিচার হল। বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হল। তাঁদের আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এটাই ছিল আলিপুরের বোমার মামলা। কিন্তু এত বড় শাস্তি যে তাঁদের দেওয়া হল তারজন্য যে প্রমাণ-সাবুদ লাগে, তা কিছুই পাওয়া যায়নি। এইসব বাঙালি দেশের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারতেন।

"যেসব ঘরে তাঁদের আটকে রাখা হত সেই ঘরগুলো দেখছিলাম আর তাঁদের দুঃখের জীবন যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সেই ছোট ঘরে বন্দি হয়ে থাকা, সেই ঘরের কোণে ময়লা ফেলা, আর দুর্গন্ধ বা নোংরা অবস্থা সম্বন্ধে নালিশ করতে গেলে চাবুক খাওয়া। খাওয়াদাওয়া যা দিত তাতে কোনওমতে প্রাণটা শরীরে আটকে থাকে, তার ওপর হাড়ভাঙা খাটুনি। দিনের বেশিরভাগ সময় হয় নারকেল দড়ি তৈরি করতে হচ্ছে, না হয় ইট ভাঙতে হচ্ছে, বা ঘানিতে তেল বের করতে হচ্ছে। কাজের সামান্য এদিক-ওদিক হলেই চাবুক। আমাদের দেশপ্রেমীদের এইভাবে শাস্তি পেতে হত।

"যাঁরা ইংরেজদের বিচারে বড় আসামি, তাঁদের আবার নির্জন ঘরে রেখে দেওয়া হত। সারাজীবন আলো-বাতাসের বাইরে একটি ঘরে জীবন কাটাতে হবে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কিছুদিনের মধ্যেই পাগল হয়ে যেতেন।

"গাইডের কোনও কথা আর তখন আমার কানে ঢুকছে না। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠান প্রহরী ভয়ানক মারছে। কী তাঁর অপরাধ ? না তিনি কাজের সময় অন্য আর এক কয়েদির সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সাধুপ্রকৃতির উপেন মুখ বুজে সে মার সহ্য করছেন।

"তাড়াতাড়ি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকালুম — সেদিকে দেখি রুগ্ণ চেহারার বারীন ঘোষকে গোরুর মতো ঘানি টেনে টেনে নারকেল পিষে তেল বের করতে হচ্ছে, তিনি আর এক পা এগোতে পারছেন না—অথচ পেছনে চাবুক নিয়ে প্রহরী হম্বিতম্বি করছে, দিনে তিরিশ পাউন্ড নারকেল তেল পিষে বের করতেই হবে। অরবিন্দের ভাই বারীনের এই দশা।

"অন্যদিকে তাকিয়ে দেখি উল্লাসকরের মতো বুদ্ধিমান তেজস্বী ছেলে উন্মাদ হয়ে গেছেন। চোখ রক্তবর্ণ, চুল উসকোখুসকো। চিৎকার করে কী যেন বলে চলেছেন। তাঁর অপরাধ, সারাদিন রোদে ইট তৈরি করে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। জেলে ফিরে এসেছিলেন। সাতদিন হাতে হাতকড়া দেওয়ালে বেঁধে তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখার ব্যবস্থা হল। সেদিন বিকেল বেলা অফিসার গিয়ে দেখেন যে, অসুস্থ অবস্থায় ওইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে জ্বরে অজ্ঞান হয়ে তিনি হাতকড়ায় ঝুলে আছেন। তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হল। উল্লাসকরের জ্বর ছাড়ল। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেলেন।

"আর সহ্য করতে পারলাম না। এক দৌড়ে সেলুলার জেলের বাইরে চলে এলাম। আর কোনওদিন ওদিক মাড়াইনি।"

বাচ্চুমামা চোখ বুজে ঘন ঘন বিড়িতে টান দিতে লাগলেন। বাজু তার আগের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নিল এ-বেলা আর গল্প জমবে না। বাজু আর বুড়োর গলার কাছে যেন কিছু একটা আটকে গিয়েছিল। কলকাতার শিক্ষিত ক'জন মানুষ দেশের স্বাধীনতা চেয়ে কী অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। সেই স্বাধীনতা পাওয়া গেল, কিন্তু ক'জন আর এইসব মানুষকে সেজন্য মনে রেখেছে ?

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বাজু আর বুড়ো উঠে বাইরে গেল। বাজু তার বন্ধুকে বলল, "তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সেরে চলে আয়। দুপুরে আবার আন্দামান যাত্রা করা যাবে।"

আন্দামানের আদিবাসী

স্নান-খাওয়া সেরে বুড়ো যখন বাজুর বাড়ি পৌঁছল, তখন ও-বাড়ির খাওয়াদাওয়া শেষ হয়ে গেছে। পেছনের বারান্দায় আরাম চেয়ারটা বের করে নিয়ে বাচ্চুমামা শরীরটা রোদে দিয়ে, মুখটা ছায়ায় রেখে ঝিমোচ্ছেন। বুড়ো আর বাজুর জন্য দুটো মোড়া সাজানো।

বাজু তার বন্ধুর অপেক্ষায় ছিল। দু'জনে গিয়ে রোদে পিঠ দিয়ে মোড়া দুটো দখল করে বসল। শীতের দুপুর, এর চেয়ে ভাল আর কী করে কাটানো সম্ভব !

ওদের দু'জনের আওয়াজ পেয়ে বাচ্চুমামা একটু নড়েচড়ে বসলেন।

"সেলুলার জেলে আর কোনওদিন যাওনি ?" জিজ্ঞেস করে বাজু।

"না," চোখ বুজেই বাচ্চুমামা উত্তর করলেন।

"তা হলে বারবার আন্দামানে যাও কেন ?" আবার প্রশ্ন করল বাজু।

"ওঙ্গেদের কাছে যাই, জারোয়াদের কাছে যাই।" বলে বাচ্চুমামা চোখ খুলে বাজু আর বুড়োর দিকে তাকালেন।

"ওঙ্গে, জারোয়া এরা সব কারা ?" বুড়োর গলা শোনা গেল। বাচ্চুমামার সঙ্গে থাকলে বেশিক্ষণ আর কারও লজ্জা থাকে না।

হুশ করে বড় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাচ্চুমামা শুরু করলেন : "আসলে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ওখানকার আদিবাসীদেরই দেশ ছিল। বঙ্গোপসাগরের বুকে অন্যসব জায়গা থেকে বহুদূরে শ'তিনেক দ্বীপ নিয়ে ছিল এই আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। সবচেয়ে কাছের দেশ বর্মা বা এখনকার মায়ানমার ১২০ মাইল দূরে, কলকাতা থেকে এর দূরত্ব ৭৮০ মাইল। এই দ্বীপগুলি নাকি ডুবো পাহাড়ের জলের ওপরে জেগে থাকা চুড়ো। সেইজন্যই এই দ্বীপপুঞ্জ উঁচু-নিচু পাহাড়ে ভূখন্ড। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চুড়োর উচ্চতা ২৪০০ ফুট। এখন এই চুড়োর নাম হয়েছে স্যাডেল পিক।

"ঘন সবুজ জঙ্গলে এই দ্বীপপুঞ্জ ঢাকা ছিল। এক-একটা বিরাট গাছ আকাশ ভেদ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকত। অনেক জায়গায় দিনের বেলায়ও সূর্যের আলো গাছের পাতা ভেদ করে মাটিতে এসে পৌঁছতে পারত না। সেই কারণে জঙ্গলের মাটিতে খুব বেশি ঘাসগুল্ম জন্মাত না বলে গাছের তলা বেশ পরিষ্কারই থাকত। তার ওপর ঝরে পড়া পাতার গালিচায় পা ডুবিয়ে চলাফেরা করতে কী আনন্দই না ছিল !

"আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল, এই গভীর জঙ্গলে বাঘ-ভালুক একেবারেই ছিল না। তাই এই দ্বীপপুঞ্জ সেদিক থেকে তেমন বিপদসঙ্কুল ছিল না। জন্তুর মধ্যে ছিল বুনো শুয়োরের দল, আর ছিল বিষাক্ত সাপ।

"এই সবুজ দ্বীপপুঞ্জ ঘিরে অগাধ সমুদ্র এবং দ্বীপপুঞ্জের গা ঘেঁষে প্রবালের প্রাচীর। এত সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে খুব বেশি ছিল না।

"এই সুন্দর দেশে বাস করত বেশ কয়েকটি আদিবাসীদের জাতি, উপজাতি। দ্বীপপুঞ্জের এক-এক অঞ্চলে ছিল এক-একটি উপজাতির আধিপত্য। এসব বিশেষ অঞ্চলের আধিপত্য নিয়ে এক উপজাতির সঙ্গে আর-এক উপজাতির কখনও-কখনও যুদ্ধ হত, তবে তা ভয়ানক আকার ধারণ করত না।

"কী সুন্দর ছিল ওদের চেহারা, কুচকুচে কালো স্বাস্থ্যবান শরীর, মাথা ভরা কোঁকড়ানো চুল।

"অনেকেই বেশি লম্বা নয়, আবার কেউ কেউ বেশ লম্বা হত। জামাকাপড় তারা পরতে শেখেনি। স্ত্রী-পুরুষ সবাই কোমরে পাতার একটা ঝালর পরত, আবার কেউ কেউ বুকে গাছের ছালের একটা বেল্টের মতো পরত।

"হাতে তীর-ধনুক নিয়ে যখন এরা জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করে বেড়াত, দেখে মনে হত যেন সেই জঙ্গল তাদের জন্যই যেন সৃষ্টি হয়েছে, তারাই তো প্রকৃতির সন্তান। শিকার করে, সমুদ্রে মাছ ধরে আর ফলমূল সংগ্রহ করেই তারা জীবনধারণ করত। জঙ্গলের শুয়োর আর সমুদ্রের মাছ, কাঁকড়া, কচ্ছপ আর মৌমাছির মধু বা ফলমূল এই ছিল তাদের খাদ্য।

"আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নদী বা ঝরনার কিছুটা অভাব ছিল। তাই এই প্রকৃতির সন্তানদের জলের উৎস ঘিরে বসতি স্থাপন করতে হত। তবে জলের অভাব বিশেষ হত না। প্রকৃতি তার সন্তানদের ভালবাসত এবং তাদের খাদ্য-পানীয়ের অভাব মেটাত, তারাও প্রকৃতিকে ভালবাসত, তার ভাষা বুঝত। গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার ও মানুষ রেষারেষি না করে পাশাপাশি বাস করত। সেই বিরাট বিরাট হাজার বছরের প্রবীণ বৃক্ষের কাছ থেকে তারা কত কী জানতে পারত।

"আন্দামানে যে আদিবাসীরা বসবাস করত, তাদের বইয়ের ভাষায় 'নেগ্রিটো' জাতি বলা হয়। আফ্রিকার আদিবাসীদের সঙ্গে এদের চেহারার মিল, আবার বর্মা, ইন্দোনেশীয় অঞ্চলেরও এক জাতি নেগ্রিটো বলে পরিচিত। আন্দামানের মানুষেরা কোথা থেকে ওই দ্বীপে পৌঁছল সে নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে নানা ঝগড়া আছে। কেউ কেউ বলেন যে, একসময়ে এশিয়ার ভূখন্ডের সঙ্গে সমুদ্রের তলার পাহাড় দিয়ে এই দ্বীপ যুক্ত ছিল। সেই পথেই এই জাতি আন্দামানে এসেছিল। এখন সেসব পাহাড় জলের তলায় তলিয়ে গেছে। আবার অন্যেরা বলেন, ভেলায় চড়ে জলপথেই নাকি এরা এসেছিল। যেভাবেই এসে থাকুক, হাজার হাজার বছর ধরে এরা আন্দামানে বাস করেছে।

"তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল, গান ছিল, নাচ ছিল, উৎসব ছিল। সেই নাচ গানের একটা বিকৃত রূপ এখনও কোথাও কোথাও দেখা যায়। হাঁটুর ওপর হাত রেখে তাল ঠুকে তারা লাফিয়ে লাফিয়ে নাচে আর গায়।

"তাদের বাসস্থানও ছিল বেশ মজার। বড় গোলপাতার ছাউনি দেওয়া কুটিরে একটা গোটা সমাজ একসঙ্গে বাস করত। এই কুটিরের এক-একটা অংশ এক-একটি পরিবারের জন্য আলাদা করা থাকত। সেইটুকু জায়গাতেই তাদের শোয়া-বসা, সেখানেই তার ঘরকন্না, সেখানেই জন্ম-মৃত্যু। এদের অনেকে শোয়ার জায়গার নীচে মাটিতে মৃতদের কবর দিত। সুতরাং সেই ছোট্ট অংশটা একটা পরিবারের—বাকি পুরোটাই সমাজের।

"জঙ্গলে যখন এরা শিকার করতে যেত সেখানেও ছোট-ছোট চালা বানিয়ে নিত। এগুলি ছিল তাদের অস্থায়ী ঘর।

"পরিবারের পুরুষরা পরিবারের জন্য শিকার করে আনত, মেয়েরা ফলমূল সংগ্রহ করত। পুরুষেরা ক্যানো নৌকোয় বড় মাছ বা কচ্ছপ মারতে যেত, আর কম জলে ছোট-ছোট জাল দিয়ে মেয়েরা ছোট মাছ ধরত। বড় মাছ মারার অস্ত্র তীর-ধনুক অথবা হারপুন।"

"হারপুন কী ?" জিজ্ঞেস করে বুড়ো।

"হারপুন বর্শার মতো অস্ত্র—যার নীচের দিকে লম্বা গাছের ছালের দড়ি বাঁধা থাকত। ক্যানোর ওপরে দাঁড়িয়ে সেই বর্শা ছুড়ে যখন কচ্ছপ বা বড় মাছকে ওরা বিদ্ধ করত, সেই বিঁধে থাকা বর্শা নিয়ে কচ্ছপ ডুব দিত জলের তলায়। দড়ির এক অংশ থাকত শিকারির হাতে। তারপর শিকারি খেলিয়ে খেলিয়ে শিকার তুলত ক্যানোয়।

"যখন কেউ শুয়োর বা বড় কচ্ছপ মারত তা আর কারও নিজস্ব সম্পত্তি থাকত না, সমাজের সবাই ভাগ করে নেওয়াই ছিল রেওয়াজ। সবাই মিলেমিশে কী করে বাঁচতে হয় তা এদের দেখে শেখা যায়।

"এরা নিজেদের নিয়ে বেশ সুখেশান্তিতেই জীবন কাটাত। কিন্তু পৃথিবীতে কেউ কাউকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। আন্দামানের জঙ্গলে গাছ আছে। সেই কাঠের অনেক দাম। তা ছাড়া অন্যান্য বনজ সম্পদও ওখানে পাওয়া যায়। এমনকী এখানকার মানুষদের ধরেও তো ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে টাকা রোজগার করা যায়।

"এইসব কারণে বাইরের জগতের লুব্ধদৃষ্টি গিয়ে পড়ল এই দ্বীপপুঞ্জের ওপর।

"মালয় থেকে জলদস্যুরা এসে লুঠপাট করত, বনের গাছ কেটে নিয়ে যেত, এমনকী এদের মেয়ে-পুরুষদের ধরে নিয়ে যেত। তাদের অন্য দেশে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করত। এইজন্য বাইরে থেকে জলপথে যারাই এই দ্বীপপুঞ্জে আসত, আন্দামানের বাসিন্দারা তাদের ভয় পেত। সেই কারণে সুযোগ পেলেই দ্বীপবাসীরা সমুদ্রপারের লোকেদের মেরে ফেলত। তাই যারাই জাহাজে এই দ্বীপে পৌঁছত, তারা সবাই দ্বীপপুঞ্জকে আতঙ্কের দ্বীপ বলে বর্ণনা করত।

"আমাদের বিচার করার ধারাটাই কেমন জানি অদ্ভুত। আমরা যদি তাদের বাসস্থান নষ্ট করি, তাদের ধরে এনে হাটে বিক্রি করি, তাদের ওপর অত্যাচার করি, তা হলে সেসব দোষের হয় না। কিন্তু নিজেদের বাঁচানোর জন্য, ভয়ে যদি তারা আমাদের মারে তা হলে তারা হয়ে যায় অসভ্য, বর্বর।

"যাই হোক, এসব বিপদ-আপদ সত্ত্বেও আন্দামানের আদিবাসীরা বেশ ভালই ছিল।

"তারপর গত শতকে অনেক শক্তিশালী সভ্যতার লুব্ধদৃষ্টি তাদের ওপর গিয়ে পড়ল। যারা নিজেদের সভ্য বলে গর্ব করে, তাদের লুব্ধদৃষ্টি যেখানেই পড়ে সেখানকার মানুষের জীবন তারা একেবারে তছনছ করে দেয়।

"আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের কথা তো নিশ্চয় তোমরা শুনেছ ?"

"হ্যাঁ শুনেছি।" দু'জনে বলে ওঠে, "তাদের সম্বন্ধে সিনেমাও দেখেছি।"

"যাদের রেড ইন্ডিয়ান বলা হয় তারাই তো আমেরিকার বাসিন্দা ছিল। তারপরে ইউরোপের মানুষের লুব্ধদৃষ্টি গিয়ে পড়ল আমেরিকার ওপর। বেচারা রেড ইন্ডিয়ানরা বন্দুকের ব্যবহার জানত না। তীর-ধনুক নিয়ে কি আর বন্দুকের সঙ্গে এঁটে ওঠা যায় ? তাই তাদের মেরেধরে তাদের দেশ অধিকার করে বসেছিল এই ইউরোপের মানুষেরা। আজ যদি আমেরিকা যাও তা হলে দেখতে পাবে যে, যে ক'জন রেড ইন্ডিয়ান এদের হাত থেকে বেঁচে গেছে তারা এখন নেশা করে, অসুস্থ হয়ে প্রায় আধমরা হয়ে বেঁচে আছে। আর যারা তাদের দেশ অধিকার করে বসল তারা আজ কত স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়।

"অস্ট্রেলিয়াতেও আদিবাসীদের বাস ছিল। ইংরেজরা নিজেদের দেশ থেকে রাজনৈতিক বন্দি, অন্য অপরাধীদের সব অস্ট্রেলিয়ায় দ্বীপান্তরে পাঠাতে শুরু করল। তারপর সেই একই গল্প। সেখানকার আদিবাসীরাও আজ বিতাড়িত, আর ইংল্যান্ড থেকে যারা ওখানে গিয়েছে তারা সদর্পে আজ সেখানে রাজত্ব করছে।

"আন্দামানেও ঠিক তাই হল। ইংরেজরা তখন ভারতবর্ষে রাজত্ব করছে। সিপাহি বিদ্রোহের পর বন্দিদের ভারতবর্ষে রাখাটা ইংরেজ-রাজ নিরাপদ মনে করল না। ১৮৫৮ সালে ইংরেজ সরকার প্রথম কয়েদি দলকে আন্দামানে পাঠায়। সেলুলার জেলের সেই শুরু।

"আন্দামানের আদিবাসীরা এই ঘটনাকে মোটেই ভাল চোখে দেখল

না। দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। কিন্তু বন্দুকধারী ইংরেজদের সঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে আদিবাসীরা পারবে কেন ? তারা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তিন বছরেরও বেশি জাপানিরা এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে বসেছিল। সেই সময়েও বহু আদিবাসী জাপানিদের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

"জাপানিরা চলে যাওয়ার পর কিছুদিনের জন্য এখানকার জেলখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। জেলখানার অনেকটা জাপানিরা ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল।

"ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর আন্দামানকে ভারতবর্ষের একটা অংশ বলে ঘোষণা করা হল। কার দেশ, কে নেয় তার তো কোনও যুক্তি থাকে না। জোর যার মুলুক তার, এ-কথা তো সবাই জানে। ইংরেজরা যে কেবল জেলখানা গড়বার জন্য আন্দামানে এসেছিল তা তো নয়। পাছে অন্য কোনও শক্তি এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে বসে, সেই ভয়ে এবং সেখানকার সম্পদের লোভে ওখানে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছিল। গাছ কেটে বন তছনছ করে তারা তাদের কাজ চালিয়ে গেল। যত বসতি বাড়ে, জঙ্গল তত পিছিয়ে যায়।

মালয় থেকে জলদস্যুরা এসে লুঠপাট করত, বনের গাছ কেটে নিয়ে যেত, এমনকী এদের মেয়ে-পুরুষদের ধরে নিয়ে যেত। তাদের অন্য দেশে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করত। এইজন্য বাইরে থেকে জলপথে যারাই এই দ্বীপপুঞ্জে আসত, আন্দামানের বাসিন্দারা তাদের ভয় পেত।

"যখন আদিবাসীরা পালিয়ে গেল—তখনও তাদের রেহাই নেই। তাদের সঙ্গে ইংরেজরা এক নতুন খেলা শুরু করল। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকলে তাদের ধরাও যায় না। অথচ তাদের সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটা ভয় থেকেই যায়। তাই ইংরেজরা স্থির করল যে, এই আদিবাসীদের লোভ দেখিয়ে পোষ মানাতে হবে। ইংরেজরা মোটরবোটে বন্দুকধারী পাহারা নিয়ে, আদিবাসীদের আস্তানা খুঁজে বের করে, তার কাছাকাছি গিয়ে প্রচুর উপহার ফেলে দিয়ে আসত। লোহার বালতি, বাসন, প্রচুর নারকেল, শুয়োর ইত্যাদি ছিল তাদের উপহার।

"মাঝে-মাঝে সুযোগ পেলে আদিবাসীদের ধরে পোর্টব্লেয়ারে নিয়ে আসত। সেখানে তাদের বন্দি করে রেখে প্রচুর খাদ্য-পানীয় দিয়ে তুষ্ট করে আবার তাদের ছেড়ে দিয়ে আসত।

"এই চাতুরিতে যারা ভুলল তাদের সর্বনাশ তাড়াতাড়ি হল। যারা ইংরেজদের অবিশ্বাস করত, তাদেরও সর্বনাশ হল, তবে কিছুটা দেরিতে।

"এই নেগ্রিটো আদিবাসীদের চারটি জাতির চারটি নাম দেওয়া হয়েছে, যারা সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি—উত্তর থেকে দক্ষিণ আন্দামান যাদের বিচরণক্ষেত্র ছিল, তাদের 'বৃহৎ আন্দামানি' বলা হয়। জারোয়ারা দক্ষিণ ও মধ্য আন্দামানের পশ্চিম উপকূলে বাস করত। 'লিট্‌ল আন্দামান'-এ বাস করত ওঙ্গিরা, দক্ষিণ আন্দামানের একটি ছোট দ্বীপ—সেন্টিনাল দ্বীপে সেন্টিনালিরা বাস করত। এসব নাম অবশ্য আদিবাসীরা জানে না, ইংরেজরাই এ নাম দিয়েছিল।

"ইংরেজদের পোষ মানানোর খেলায় সবচেয়ে আগে এবং বেশি করে সাড়া দিল বৃহৎ আন্দামানিরা। এদের সঙ্গে বাইরের মানুষের বেশ ভাল সম্পর্ক হয়ে গেল। ওঙ্গিরাও কিছুদিন পরে ওই একই ফাঁদে পা দিল।

"আর যাবে কোথায় ? নিজেদের শিকার সংগ্রহ ভুলে সমুদ্রপারের লোকেদের মতো হতে গিয়ে এরা প্রায় উজাড় হয়ে গেল।

"আগেই যুদ্ধে শত শত পুরুষ প্রাণ দিয়েছিল, তারপর সভ্যতা তাদের মধ্যে এমন সব রোগ ছড়িয়ে দিল, যা তাদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। সেইসব রোগে আবার অনেকে মরল। জামাকাপড় পরতে শিখে প্রকৃতির সঙ্গে শরীরের বিচ্ছেদ ঘটে গেল। জলও বৃষ্টি আগে কোনও ক্ষতি করতে পারত না, সভ্য হয়ে জ্বরে ভোগে আর মরে। তা ছাড়া সভ্যরা তাদের আফিং খেতে শেখাল। এইভাবে কত জাতি যে নিঃশেষ হয়ে গেল তার হিসেব কে রাখে ! আজকের হিসেব অনুযায়ী বৃহৎ আন্দামানিদের সংখ্যা ২২ জনে এসে ঠেকেছে, আর ওঙ্গিরা ৯৮ জনের মতো বেঁচে আছে।

"জারোয়া আর সেন্টিনালিরা ইংরেজদের পোষ মানেনি। তারা আজও জঙ্গলে আগেকার মতোই বাস করে। যদিও জঙ্গল কেটে দেওয়াতে এদেরও ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু এদের সংখ্যা এখনও অতটা কমে যায়নি। সভ্যতাকে জানবার আগে বৃহৎ আন্দামানিরা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং তাদেরই সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি।

"বন কেটে উজাড় করে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা হয়েছে, বসতি হয়েছে, চাষের খেত হয়েছে। ফলে আদিবাসীদের একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে আধুনিক সভ্যতা।

"স্বাধীনতার পরে ভারত সরকার এই বৃহৎ আন্দামানিদের জন্য এখন বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। তাদের চাল-ডাল ভিক্ষে দেওয়া হয়। তারা সরকারের দয়ায় বেঁচে আছে। কোনও কাজ করতে চায় না, দাওয়ায় বসে নেশা করে আর ঝিমোয়।

"ওঙ্গিদের জন্যও ব্যবস্থা হয়েছে। যদিও ওঙ্গিরা সরকারের দেওয়া বাড়িতে থাকতে চায় না। এখনও একটু-আধটু শিকার করা, মাছধরা এদের অভ্যাস আছে। কিন্তু সে আর বেশিদিন নয়।

"ইংরেজ যে ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিল, স্বাধীন ভারতের সরকার সেইটাই চালিয়ে যাচ্ছে।

"আর জারোয়া সেন্টিনালিদের সঙ্গে ভারত সরকার, ইংরেজদের শেখানো পোষ মানানোর খেলা আজও খেলে চলেছে। এখনও এদের জন্য সমুদ্রের ধারে উপহার নামিয়ে দিয়ে আসা চলেছে। জারোয়ারা সাড়া দিতে শুরু করেছে, সেন্টিনালিরাও দেবে। এইভাবে আধুনিক সভ্যতা রেড ইন্ডিয়ানদের মতো, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মতো আন্দামানের প্রকৃতির সন্তানদের শেষ করে দিল।"

বাচ্চুমামা বিরাট নিশ্বাস ফেললেন। চোখ বুজে ঘন ঘন বিড়িতে টান দিতে শুরু করলেন।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পর বুড়ো জিজ্ঞেস করল, "বাচ্চুমামা, তুমি এদের সবার কাছেই গিয়েছ ?"

"চিড়িয়াখানায় যেমন খাঁচায় বন্ধ জন্তুদের তোমরা দেখতে যাও—অনেকে সেইরকম আন্দামানিদের বা ওঙ্গিদের দেখতে যায়। জারোয়াদের কাছে যাওয়া যায়, কিন্তু ওরা এখনও সভ্য মানুষদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না বলে ওদের সঙ্গে থাকা যায় না। আর সেন্টিনালিরা সভ্য মানুষের কাছেই আসতে চায় না।"

"তা হলে ওরা সভ্য হবে কী করে ?" বাবু জিজ্ঞেস করে বসে।

প্রশ্নটা শোনামাত্র বাচ্চুমামার চোখদুটো ধক করে জ্বলে উঠল। শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে বসে বাচ্চুমামা বেশ উঁচুস্বরে বলে উঠলেন, "কিসের সভ্যতা ? গাড়িঘোড়া চড়া, বড়-বড় বাড়িতে বাস করা আর ভাল

জামাকাপড় পরলেই বুঝি মানুষ বড় হয়ে যায় ? আমাদের সভ্য সমাজে যারা ভাল খায়, ভাল পরে, তাদের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যার মানুষ ভাল করে খেতে পায় না, শীতে কষ্ট পায়, অসুখ হয়ে মরে। জারোয়ারা একটা শুয়োর বা বড় একটা কচ্ছপ মারলে সেটা কারও নিজের থাকে না, সমাজের সবাই তার ভাগ পায়। চুরি করা কাকে বলে সেন্টিনালিরা তা জানতই না। অথচ খাদ্য সংগ্রহ করা বা বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা তাদের পক্ষে মোটেই সহজ নয়। তারা নেশা করত না, কোনও রাজাকে তাদের শাসনে রাখতে হয়নি। আমি তো জানি না সভ্যতা কাকে বলে। আর আমাদের সভ্যতা নিয়ে অত গর্ব করার আছেটা কী ?"

বাজু বেচারা বেশ ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলল, "না, না, ওদের আমি খারাপ বলিনি। তবে শিক্ষিত তো হতেই হয়।'

"শোন, যে শিক্ষা নিজেকে অন্যের থেকে আলাদা করে দেখতে শেখায় সে শিক্ষার কানাকড়ি দাম নেই।" বললেন বাচ্চুমামা, "ওরা তো গাছপালার খবর রাখত, ঋতু পরিবর্তন কখন হবে স্পষ্ট বুঝত, জন্তু-জানোয়ারদের, পোকামাকড়ের গতিবিধি ওদের নখদর্পণে। ওরা মাছের চলাফেরার সময় সম্বন্ধে সচেতন ছিল। ওদের প্রকৃতিকে বেশ ভাল করেই জানা ছিল। এটা বিজ্ঞান নয় ? কী সুন্দর সব পৌরাণিক গল্প ওদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, গান ছিল, উৎসব ছিল।

"তা ছাড়া জোর করে শিক্ষিত করার অধিকার কার আছে ? ওরা নিজে থেকে যদি লেখাপড়ার প্রয়োজন বোধ করত—তা হলে তার ব্যবস্থা নিশ্চয় ওরা করে নিত। সবচেয়ে বড় কথা, তারা ভালবাসতে জানত। আজকের দিনের সভ্যতা, সমাজব্যবস্থা আমাদের ভালবাসতে ভুলিয়ে দিয়েছে।" একনিশ্বাসে এতটা বলে বাচ্চুমামা যেন একটু হাঁফিয়ে গেলেন।

বাজু মনে-মনে ভাবতে লাগল, কী কুক্ষণেই না সভ্যতা, শিক্ষা এসব বড় বড় কথা তুলতে গিয়েছিলাম ! এদিকে গল্পটা যে মাটি হতে বসেছে।

বুড়ো মিনমিন করে বলল, "বাচ্চুমামা, ওদের পৌরাণিক গল্প একটা বলো না !"

"বৃহৎ আন্দামানি বা আন্দামানি যাদের বলা হয়, তাদের কাছে এই গল্পটা শুনেছিলাম। অনেক, অনেকদিন আগে এই আন্দামানে ছিল কেবল বিরাট বিরাট গাছপালা, আর সেই জঙ্গলে ছিল কিছু জন্তু-জানোয়ার আর গাছের ডালে পাখি। জঙ্গলের ধারে সমুদ্রে ছিল মাছ, কচ্ছপ। আর ছিল একটি, মাত্র একটি মানুষ। তার নাম ছিল মাইদিক। সে ছিল পুরুষ। মাইদিক একা একটি পাতার ছাউনিতে বাস করত। সারাদিন সে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, শিকার করত। মাঝে-মাঝে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জল তোলপাড় করত। বড় বড় মাছ, কচ্ছপের সঙ্গে ছিল তার খেলা। কচ্ছপের পিঠে বসে সে সীমাহীন সমুদ্রে কতদূরে চলে যেত। আঁধার হলে চাঁদের আলোয় পথ চিনে সে তীরে ফিরে আসত।

সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই তার দিন কাটত। কিন্তু মাইদিকের মাঝে-মাঝেই মনখারাপ হত। কারণ তার কোনও সঙ্গী ছিল না। গাছপালা ছিল ; পাখি, জন্তু-জানোয়ার, মাছ, কচ্ছপ ছিল, তাদের ভাষাও মাইদিক বুঝত। কিন্তু তাদের সঙ্গে তো ঠিক গল্প করা চলে না।

"মাইদিক মনের দুঃখে একা-একা গান গেয়ে ঘুরে বেড়াত। ছাউনিতে ফিরেও তার খুব মনখারাপ হত। তার বারবার মনে হত, একটি সঙ্গী পেলে বড় ভাল হত। দু'জনে কত গল্প করে, গান গেয়ে, একসঙ্গে বেড়িয়ে ঘুরে কাটানো যেত।

"একদিন মাইদিক সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে জঙ্গলে গেল না। সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেও তার ইচ্ছে করল না।

"হঠাৎ কী মনে করে, মাইদিক ঝরনার ধারে চলে গেল। সেই ঝরনার ধার থেকে জলে ভেজা নরম মাটি সংগ্রহ করে মাইদিক তার ছাউনিতে ফিরে এল। তারপর খুব যত্ন করে সেই নরম মাটি দিয়ে একটা মূর্তি গড়তে শুরু করল। স্থির করল যে, নিজেই সে তার সঙ্গে থাকার জন্য আর একজনকে বানিয়ে নেবে।

"সকাল থেকে মাইদিক মূর্তি গড়ার কাজে লেগে গেল। ভিজে মাটির সঙ্গে মাইদিকের আঙুলগুলি যেন কথা বলে। সারাদিন ধরে সেই মূর্তি গড়তে লাগল।

"সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে, মেঘে-মেঘে যখন রং লাগতে সবে শুরু করেছে, পাখিরা সব যখন বাসায় ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তখন মাইদিকের মূর্তি গড়া শেষ হল। তার অজান্তেই সে অপূর্ব সুন্দরী এক স্ত্রীলোকের মূর্তি গড়েছে।

"বনে যখন আঁধার নেমে এল, মাইদিক মূর্তি গড়া শেষ করে ক্লান্ত হয়ে সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

"পরের দিন সকালে উঠে মাইদিক তার হাতেগড়া মাটির স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

"গতদিন থেকে তার শিকারে বেরনো হয়নি, খাওয়াদাওয়া হয়নি। খিদেতে যখন তার বসে থাকা দায় হল, তখন তীর-ধনুক নিয়ে সে শিকারের সন্ধানে বের হল। শিকার নিয়ে গান গাইতে-গাইতে যখন মাইদিক তার ছাউনিতে ফিরছে, কাছাকাছি পৌঁছে সে চমকে থেমে গেল। কী একটা শব্দ শোনা গেল না ?

"গান বন্ধ করে খুব সন্তর্পণে সে ছাউনির দিকে এগিয়ে গেল। কিছুটা এগোতেই আবার সেই শব্দ। খিলখিল করে কে যেন হেসে উঠল। এক দৌড়ে মাইদিক তার ছাউনিতে গিয়ে পৌঁছল। ভেতরে যা দেখল, তাতে তার চক্ষুস্থির। তার তৈরি মূর্তি উঠে বসে খিলখিল করে হাসছে। মাইদিক বাইরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কী সুন্দরী সেই মেয়ে !

"সেইদিন থেকে তারা দু'জনে একসঙ্গে বাস করতে লাগল। মাটি দিয়ে তৈরি বলে তার নাম হল কাট। কাট মানে পৃথিবী। কাট—মাইদিকের বউ। আর আন্দামানিরা সবাই মাইদিক আর কাটের বংশধর।"

এই বলে বাচ্চুমামা থামলেন। কী ভাল গল্প। বুড়ো, বাজু অবাক হয়ে বাচ্চুমামার গল্প শুনল।

বেলা গড়িয়ে গেছে। বাজুর মা এসে বাচ্চুমামাকে চা দিয়ে গেলেন। বুড়ো, বাজুর জন্য এল বাটিভরা চিড়েভাজা।

চিড়ে চিবোতে-চিবোতে বুড়ো বাচ্চুমামাকে জিজ্ঞেস করল, "আন্দামানিদের সঙ্গে কোথায় তোমার দেখা হয় ?"

"আন্দামানিদের অবস্থাটাই সবচেয়ে করুণ, অথচ একদিন এরাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। তাদের জাতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। স্ট্রেট আইল্যান্ডে যে বসতি গড়ে দেওয়া হয়েছিল সেখানেই বাকি ক'জন আশ্রয় নিয়েছে। ওদের ওই বসতিতে আমি বহুবার গিয়েছি। ওদের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে।"

"ওরা তোমার সঙ্গে কী ভাষায় কথা বলে ?" বাজু প্রশ্ন করল।

"ওরা হিন্দিটা অনেকেই বলে। এক-দু'জন ভাঙা বাংলাও বলতে পারে।" বাচ্চুমামা বললেন।

বুড়ো, বাজু গল্পের নেশায় বিকেলের খেলা ভুলে গেছে। বুড়োর ভাবনা, বিকেলে বাড়ি না ফিরলে হয়তো দিদার কাছে বকুনি খেতে হবে।

বাজুর মা যেন ওর মনের কথা বুঝে ফেললেন। তিনি বুড়োকে বললেন, "বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না তো ? আমি একটু বেরোচ্ছি—তোমাদের বাড়ির দিকেই যাব। আমি তোমার দিদাকে বলে দেব যে, তুমি আমার বাড়িতেই আছ।"

বুড়ো হাতে স্বর্গ পেল। একগাল হেসে সে বাজুর মায়ের দিকে তাকাল। তিনি বুড়োর মাথার চুলগুলো উস্‌কোখুসকো করে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

তিনজনে বারান্দা ছেড়ে ঘরে এসে বসল।

"আন্দামানিদের গল্পই হোক," দু'জনে বলে ওঠে।

"তবে শোনো।"

স্ট্রেট আইল্যান্ড

"সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা। আমার বয়স তখন কুড়ি-বাইশ হবে। তখনও দেশ স্বাধীন হতে অনেক বছর বাকি, মার্চ মাসের মাঝামাঝি পোর্টব্লেয়ারে গিয়ে পৌঁছলাম। উদ্দেশ্য ছিল আন্দামানের আদিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, তাদের সম্বন্ধে আরও জানা। বুঝতেই পারছ, এদের সম্বন্ধে আমার উৎসাহ কতদিনের।

"পোর্টব্লেয়ারের রাস্তায় একদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম এক বেঁটেখাটো বৃদ্ধা মহিলাকে অল্পবয়সী কিছু ছেলে খুব বিরক্ত করছে। 'পাগলি বুড়ি, পাগলি বুড়ি' বলে ছোট ছেলেগুলো চেঁচাচ্ছে আর ঢিল ছুড়ছে। মহিলা রেগে গিয়ে গালাগালি করছেন, তাতে ছেলেরা আরও মজা পাচ্ছে।

"সেদিকে এগিয়ে গেলাম, ধমক দিয়ে সেখান থেকে ছেলেগুলোকে তাড়িয়ে দিলাম। বৃদ্ধা একটু হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর এগিয়ে এসে হাত পেতে ভিক্ষে চাইলেন।

"সে এক অদ্ভুত চেহারা! বেঁটে, কালো, কপালটা কীরকম যেন নিচু। মাথায় খুব কোঁকড়া চুল, সারা মুখের চামড়া কুঁচকে গিয়ে অজস্র দাগ পড়েছে। নাকটা কিছুটা বোঁচা, নাকের ফুটো দুটো বড় গোছের। ঠোঁট দুটি বিশেষ পুরু নয়। দেখেই বোঝা যায়, অনেক বয়স হয়েছে। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। দূরে বসানো ছোট ছোট চোখ কুঁচকে হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পকেট থেকে একটা দু'টাকার নোট বের করে তাঁর হাতে গুঁজে দিলাম। নোটটা দেখে হাসিটা কেমন দপ করে নিভে গেল। অবাক, করুণ চোখে বৃদ্ধা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কোনও কথা না বলে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে রাস্তায় মোড় নিয়ে কোথায় হারিয়ে গেলেন।

"মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। দুর্ধর্ষ বৃহৎ আন্দামানি উপজাতির আজ এ কী অবস্থা? যাদের ভয়ে একদিন আন্দামান উপকূলে জাহাজ ভিড়ত না, তাদেরই একজনকে আজ ভিক্ষে করে বেড়াতে হচ্ছে?

"রাতে ভাল ঘুম হল না। নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে গিজগিজ করতে থাকে, যার উত্তর খুঁজে পাই না। বারবার সেই বৃদ্ধার করুণ মুখটা চোখে ভেসে উঠতে লাগল।

"জারোয়া, সেন্টিনালিরা তো আজও বনের মধ্যে তাদের নিজস্ব চরিত্রের অনেকটাই বাঁচিয়ে রেখেছে। যদিও 'সভ্যতা' ভূতের মতো তাদের পেছনেও তাড়া করে বেড়াচ্ছে, কোনওমতেই নিজেদের মতো করে তাদের বাঁচতে দেবে না, কিন্তু বহু বছর ধরে তো তারা লড়াই করে যাচ্ছে।

"এইসব নানা কথা ভাবতে-ভাবতে শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছি।

"পরের দিন সকালে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। সেদিন স্ট্রেট আইল্যান্ড যাওয়ার কথা। এই স্ট্রেট আইল্যান্ডে আন্দামানিদের সরকারিভাবে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই আন্দামানিদের মধ্যে যে ক'জন এখনও মৃত্যু এড়িয়ে টিকে আছে তাদের বাড়ি দেওয়া হয়েছে, খাবার দেওয়া হয়, জামাকাপড় ও প্রয়োজনীয় অন্যসব জিনিস দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তারা এখন জামাকাপড় পরতে শিখে সভ্য হয়েছে, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই অসুস্থ।

"সরকারি চাকুরে বন্ধু যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর দয়াতেই এই আন্দামানিদের দ্বীপে যাওয়া সম্ভব হয়। সাধারণ মানুষের সেখানে যাওয়ার অনুমতি নেই।

"সূর্য ওঠার আগেই মোটরবোটে রওনা দেওয়া গেল। রাত জাগার ক্লান্তি আর সমুদ্রের ঠান্ডা হাওয়া, বোটের দুলুনিতে সারা শরীর অবশ করে দিল। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে, অথচ ঘুমোতে ইচ্ছে করে না। সমুদ্রে সূর্য ওঠার দৃশ্য যে কত সুন্দর তা যারা না দেখেছে তাদের কাছে বর্ণনা করা শক্ত। সীমাহীন জলের ওপর ফেনা ছড়িয়ে মোটরবোট লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলেছে। সেই ফেনার অংশটি পেরিয়ে যেদিকেই তাকাও নীল সীমাহীন জল। সেই জল ক্রমাগত ওঠানামা করে, আর ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। আকাশের নীল আর সাগরের নীল দিকচক্রবালে গিয়ে মেশে। আর সেই নীল প্রথমে রুপোলি, তারপর সোনালি এবং তারপরে লালের কত না আভায় বদল হয়ে যেতে থাকে।

"সমুদ্রে নানা ধরনের মাছের খেলা। সেই মহান শিল্পীর হাতের কাজ দেখতে-দেখতে এগিয়ে চললাম। কখনও-কখনও ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে যায়। আবার ধড়মড় করে উঠে বসি, পাছে কোনও ছবি দেখার সুযোগ হারাতে হয়।

"আকাশের যে অংশটা সবচেয়ে লাল হয়েছে আর জলে আবির ছড়াচ্ছে, তার মাঝখানে সমুদ্রের জল থেকে সূর্যের লাল রঙের গোলাটা লাফ মেরে জল থেকে উঠে পড়ল। দেখতে-দেখতে লাল রং ফিকে হয়ে এল—চারদিক আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"এইভাবে বেশ ক'ঘন্টা যাওয়ার পর একটি দ্বীপের তটরেখা দেখা দিল। দেখতে-দেখতে দ্বীপটি কাছে এগিয়ে এল। ছোট্ট দ্বীপ। চোখের সামনেই দু'দিকের তটের সীমারেখা বেঁকে গিয়েছে। কী অপূর্ব দৃশ্য। সারা দ্বীপটা বিরাট-বিরাট গাছের জঙ্গলে ভরা। দু'-তনশো ফুট উঁচু গাছ চারদিকে ডালপালা মেলে দ্বীপটিকে ঢেকে রেখেছে। মোটরবোট থেকে নেমে একটা ডিঙিতে করে সদলবলে বালুচরে নামা গেল। দলের সবাই সরকারি চাকুরে, তার মধ্যে একা আমিই বাইরের লোক।

"বন্ধুবর আমাকে নিয়ে বালি পেরিয়ে আন্দামানিদের আস্তানার দিকে চললেন। বালুচর থেকে একটা পায়ে চলার পথ এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে গাছপালার মধ্যে দিয়ে। সমুদ্রের ধারে জঙ্গল অনেকটা হালকা। কিন্তু সামনে তাকিয়ে যে দুর্ভেদ্য জঙ্গল দেখা যায় তা যেমন ভয় ধরানো, আবার তেমনই আকর্ষক। জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বন্ধুবর আমাকে সাবধান করে দিলেন, "একা-একা কোনওমতেই জঙ্গলের ধারেকাছে যাবেন না। একবার ওর মধ্যে ঢুকলে পথ হারাবার সম্ভাবনা খুব বেশি। আর পথ হারালে সারাজীবন চেষ্টা করেও বেরিয়ে আসতে পারবেন না।" কথাটা শুনেই শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নীচের দিকে নেমে গেল। আর শরীরটা কেমন কেঁপে উঠল। আবার পরমুহূর্তে ওই জঙ্গল দুর্বার এক আকর্ষণে আমাকে টানতে লাগল।

"'জঙ্গলের মধ্যে যাওয়ার কি কোনও উপায় নেই?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"'গাইডের সঙ্গে যেতে পারেন। আপনি চাইলে ব্যবস্থা করতে পারি।'

"স্থির হল যে, প্রথমে খাওয়াদাওয়া সেরে কিছুটা বিশ্রাম করে নেওয়া যাবে। তারপর ঘন্টাখানেক জঙ্গলে ঘুরে এসে আন্দামানিদের আস্তানায় যাওয়া যাবে।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম। জঙ্গল সাফ করে সেখানে আন্দামানিদের জন্য আস্তানা গড়া হয়েছে। সেই বিরাট আদিবাসীদের সমাজ উজাড় হয়ে গিয়ে এখন মাত্র ২৩টি মানুষে এসে ঠেকেছে। এদের উপজাতির সংখ্যাই ছিল প্রায় দশটি। আজ আর উপজাতিগুলির আলাদা অস্তিত্ব নেই।

"সরকার আন্দামানিদের জন্য সুন্দর সুন্দর কুটির বানিয়ে দিয়েছে। তবে আন্দামানিদের মধ্যে অনেকেই সেসব কুটিরে বাস করতে চায় না, তারা ধারেপাশেই নিজেদের মতো করে পাতার ছাউনি বানিয়ে নিয়ে

তাতেই বাস করে।

"আন্দামানিদের কুটিরের অন্যধারে রয়েছে গোটাকয়েক সরকারি কর্মচারীদের বাড়ি, হাসপাতাল, ইস্কুলঘর, আর কমিউনিটি সেন্টার; যেখানে নাচগান হতে পারে অথবা সন্ধ্যায় বসে গল্পগুজব করা যেতে পারে।

"এসব থাকা সত্ত্বেও আন্দামানিরা লেখাপড়া শিখতে চায় না, কাজকর্মও বিশেষ করে না। নেশা করে আর অসুখে ভোগে।

"একটি সরকারি আস্তানায় আশ্রয় মিলল। স্নান, খাওয়াদাওয়া ও সামান্য বিশ্রামের পর গাইড এসে হাজির হল।

"গাইড মাঝবয়সী আন্দামানি। নাম বোরো। পরনে খাকি হাফপ্যান্ট, গায়ে কিছু নেই। কুচকুচে কালো রং, কোঁকড়া চুল, বোঁচা নাক, আর নাকের ফুটো দুটো যেন ওপরদিকে তাকিয়ে আছে। স্বাস্থ্যও মোটামুটি ভাল। বোরো বেশ স্বচ্ছন্দে হিন্দি বলে। কথা যদিও বিশেষ বলতে চায় না, কিছু জিজ্ঞেস করলে সংক্ষেপে উত্তর দেয় মাত্র।

"জঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হওয়া গেল। বোরো চলে আগে-আগে, আমি তাকে অনুসরণ করে এগোলাম। সামান্য কিছুটা হেঁটে এগোতেই চারদিকে গাছপালা ঘন হয়ে এল। বেশ ভয়ে-ভয়ে বোরোকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বন্দুক নিলে না, জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই?' বোরো ঝকঝকে দাঁত বের করে হেসে জবাব দিল, 'না বাবু, এ জঙ্গলে বড় জানোয়ার নেই। আছে শুয়োর আর হরিণ। হরিণও আগে ছিল না, সাহেবরা কিছু হরিণ এনে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছিল, সেগুলিই সংখ্যায় বেড়েছে। তবে সাপখোপ, শজারু অনেক আছে। তাদের থেকে সাবধানে থাকতে হয়।'

"কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর জঙ্গলে এসে পড়লাম। সে কী দৃশ্য! বিরাট-বিরাট সব গর্জন, ধূপ, বাদাম গাছ। ম্যানগ্রোভ বলে একটা গাছের সংখ্যাও খুব বেশি। অনেক গাছই অচেনা। বোরো কিন্তু বেশিরভাগ গাছই চেনে, যদিও আমাদের পরিচিত নাম বলতে পারে না। জঙ্গলের সঙ্গে বোরোর নিকট আত্মীয়তা।

"দিনের বেলা সে জঙ্গলে সূর্যের আলো ঢোকে না। বেরিয়ে পড়া গাছের শিকড়গুলো অজগর সাপের মতো পথ আগলে দাঁড়ায়। একটু অসাবধান হলেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। আমার মাথার কাছাকাছি খেয়াল না করলে নেমে আসা ডালে মাথায় আঘাত লাগতে পারে।

"বেশ কিছুটা এগিয়ে দু'জনে একটা মোটা শিকড়ের ওপর বসা গেল। সেই শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশে নিজেদের গলার আওয়াজ কেমন যেন বেমানান লাগে। তাই চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইলাম।

"হাঁটতে-হাঁটতে মনে হয়েছিল যে, জঙ্গলে প্রাণের কোনও লক্ষণ নেই। বোরো আর আমি, এই দুটি প্রাণী আর মাথার ওপরে বিরাট গাছের শামিয়ানা।

"ওই শিকড়ে বসে চারদিকে তাকিয়ে কিন্তু নানা প্রাণীর সাক্ষাৎ মিলল। এক ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে গিরগিটি দৌড়ে পালায়, গাছের গা বেয়ে পিঁপড়ের সারি উঠতে থাকে, আর কত অচেনা পোকার দল চারদিকে। একটা মরা ডালে বেশ বড় গোছের একটা প্রজাপতি ডানাটা একবার খুলছে আবার বন্ধ করছে। ডানার মাঝখানে নীল রঙের একটা চক্র, চোখের মতো একবার তাকাচ্ছে, আবার বন্ধ হচ্ছে।

"দূর দিয়ে একটা হরিণ আমাদের অবিশ্বাসের চোখে দেখতে-দেখতে কোথায় হারিয়ে গেল। সেই ঘন কালো ছায়ায় বসে মনটা কেমন জানি উদাস হয়ে ওঠে। হাজার পুরনো গাছগুলি ডালপালা মেলে মহাঋষির মতো সব দাঁড়িয়ে। গাছের ভাষা বুঝতে পারলে জীবনের অনেক দুঃখ ভোলা যেত। তাই তো আমাদের দেশের ঋষিরা সব বনের মধ্যে বাস করতেন।

"কান পেতে শুনলে বোঝা যায় যে, যাকে এতক্ষণ নিঃশব্দ বলে মনে করছিলাম তার মধ্যে অনেক কিছুই শোনা যায়। জঙ্গলে খুব একটা পাখি চোখে পড়ে না বা পাখির ডাকও তেমন শোনা যায় না। কানে আসে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর কত কিছুর নড়াচড়ার শব্দ। আরও কান পেতে শুনলে হয়তো গাছের শিরায়-শিরায় প্রাণচাঞ্চল্যের শব্দও কানে আসবে।

"সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতা মনকে শান্ত করে, অনেক ওপরে উঠতে সাহায্য করে।

"বোরোকে জিজ্ঞেস করলাম তার জঙ্গল কেমন লাগে? সে একটু চুপ করে থেকে উত্তর করল, 'আমার ছেলেবেলা তো এই জঙ্গলেই কেটেছে, এই জঙ্গলই তো আমাদের প্রাণ। মাছ ডাঙায় উঠলে যেমন হয়— আমাদের জঙ্গলের বাইরে তেমনই।'

"কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলে বোরো। কিন্তু এখন তারা শিকার ভুলতে বসেছে, জঙ্গলের ভাষাও আর সব বুঝতে পারে না। তাই এদের এত দুর্দশা।

"জঙ্গল ছেড়ে চলে আসতে মন চাইছিল না, কিন্তু আসতেই হল।

"ফিরে এসে দেখি, বন্ধুবর অপেক্ষা করছেন। আমি আসতেই দু'জনে আন্দামানিদের কুটিরগুলির দিকে এগোলাম।

"সবচেয়ে বড় কুটিরটির সামনে একটা আরাম কেদারায় এক বৃদ্ধ বসে ঝিমোচ্ছিলেন। তাঁর পাশে নারকেল গাছের গুঁড়িতে বসে ছিলেন এক বয়স্কা মহিলা। বৃদ্ধের পরনে খাকি প্যান্ট আর সাদা শার্ট, আর মহিলা মেমসাহেবদের মতো গাউন পরে ছিলেন। মহিলার মুখে চন্দনের মতো কিছু একটা জিনিস দিয়ে নানা নকশা আঁকা। অদ্ভুত লাগল। একেই বলে সভ্যতার সং সাজা। নিজেদের পুরনো অভ্যাসমতো মুখে নকশা কাটাও ভুলতে পারেননি, এদিকে আবার আধুনিকা হতে হয়েছে!

"বন্ধু আমার সঙ্গে সেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আলাপ করিয়ে দিলেন। কালো কোঁচকানো চামড়া আরও কিছুটা কুঁচকে দু'জনে হাসলেন। বৃদ্ধা উঠে গিয়ে বসার জন্য টুল এনে দিলেন।

"বৃদ্ধের নাম লোকা। নব্বইয়ের কাছাকাছি বয়স। তিনি আন্দামানের বালোয়া উপজাতির মানুষ। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা দু'জনেই বেশ হিন্দি বলেন।

"অদ্ভুত এঁর জীবনের অভিজ্ঞতা। যৌবন কেটেছে স্বাধীনভাবে বনে জঙ্গলে বাস করে, শিকার করে, মাছ ধরে আর উৎসবে গান গেয়ে, নাচ করে।

"যুদ্ধের সময় যখন জাপানিরা আন্দামান অধিকার করেছিল, তখন এদের ওপর খুব অত্যাচার হয়েছিল। জাপানিরা এদের ইংরেজদের গুপ্তচর মনে করত। এদের মধ্যে কেউ-কেউ গুপ্তচরের কাজ করেওছিল। কিন্তু বেশিরভাগ আন্দামানি ইংরেজদের শত্রু মনে করত। লোকা একবার জাপানিদের হাতে ধরা পড়ে খুব অত্যাচার সহ্য করেছিল। তারপর কোনওমতে সে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

"ইংরেজরা যখন ফিরে এল, তখন নানা উপহার দিয়ে এদের বশ করার চেষ্টা করত। বৃদ্ধদের কথা না শুনে যুবকরা ইংরেজদের কাছে ধরা দিল। সেই হল তাদের কাল।

"মহিলার নাম লিচো। দেখতে বৃদ্ধ হলেও এঁর বয়স অনেক কম।

"লোকার তৃতীয় বউ এই স্ট্রেট আইল্যান্ডের আস্তানাতেই মারা যায়। ওইখানেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। লোকা মাঝে-মাঝেই তার স্ত্রীর সমাধি দেখতে যায়, সেখানে তামাকপাতা রেখে আসে। তাদের বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তিরা এইসব তামাক ইত্যাদি খায়।

"লিচো ছিল লোকার বউয়ের বিশেষ প্রিয়। তাই লোকা লিচোর দেখাশোনা করে।

"গল্প করতে-করতে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল। সেদিনের মতো সভা ভঙ্গ করে সরকারি আস্তানায় ফিরে গেলাম।

"পরের দিন সকালেই আমি একা লোকার আস্তানায় গিয়ে হাজির হলাম। আমার মাথায় তখনও পোর্টব্লেয়ারের সেই পাগল বৃদ্ধার কথা ঘুরছে। সকালে লিচো কাজে ব্যস্ত। সুতরাং লোকাকে একা পাওয়া গেল।

"কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরই আমি সেই মহিলার কথা তুললাম, 'পোর্ট-ব্লেয়ারের রাস্তায় এক পাগল বৃদ্ধা আন্দামানি ভিক্ষে করে বেড়ায়। আপনি তাকে চেনেন নাকি ?'

"প্রশ্নটা শুনেই বৃদ্ধ লোকার মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ বসে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন 'ওই মহিলার নাম জুরুল। এখন ওর অনেক বয়স হয়েছে। ও প্রায় আমার বয়সী। ও দুধনাথের বউ— অল্প বয়সেই পাগল হয়ে গিয়েছিল। আমরা একই উপজাতির মানুষ। একসঙ্গে, একই কুটিরে, একই সমাজে আমরা যৌবন কাটিয়েছি।'

"যুদ্ধে, রোগে যখন আমাদের সমাজ উজাড় হয়ে গেল, বাকি যারা আমরা বেঁচে ছিলাম— সবাই এসে স্ট্রেট আইল্যান্ডের আস্তানায় আশ্রয় নিলাম। জুরুল পোর্টব্লেয়ারেই থেকে গেল। ওখানেই ও ভিক্ষে করে, গাছের তলায় বা রাস্তার ধারে দিন কাটায়।

"'দুধনাথ কে ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"'সে এক বিশ্বাসঘাতক। সে আমাদের সর্বনাশ করেছিল।'

"এর পর যে গল্পটা ওর কাছে শুনলাম সে এক অদ্ভুত গল্প। পরে খোঁজ করে গল্পটার সত্যতা যাচাই করে নিয়েছিলাম।"

বন্দি দুধনাথ

বুড়ো, বাজু হাঁ করে গল্প শুনছে। বাচ্চুমামা দুধনাথ তেওয়ারির গল্প শুরু করলেন :

"ভারতে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল, তার মধ্যে সিপাহি বিদ্রোহের কথা তো ইতিহাসে সবাই পড়ে। ইংরেজ-রাজ সিপাহি বিদ্রোহ দমন করার পর শত-শত বন্দি সিপাইদের আন্দামানে দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেয়। সেই রকম একদল বন্দি সিপাইয়ের সঙ্গে দুধনাথ তেওয়ারিও আন্দামানে এসে পৌঁছল। দু-একদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারল যে, সেই অমানুষিক পরিশ্রম ও ইংরেজদের অত্যাচার সহ্য করে বেশিদিন টিকে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথম থেকে সে পালাবার মতলব আঁটতে শুরু করল। কিন্তু পালাবে কী করে ? দ্বীপের চারদিকেই তো সমুদ্র, সাঁতরে পার হওয়া তো সম্ভব নয়। আর দ্বীপে যেটুকু জায়গা পরিষ্কার করে কয়েদিদের রাখা ও পাহারাদার বা অন্যান্যদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তার বাইরে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। যদিও জঙ্গলে বাঘ-ভালুক নেই, কিন্তু আন্দামানিদের হাতে পড়লেও মৃত্যু। অথচ কয়েদিজীবন সহ্য করা যাচ্ছে না।

"অনেক কয়েদি শলাপরামর্শ করে স্থির করল যে, তারা জঙ্গলেই পালাবে, তারপর দেখা যাবে তাদের কপালে কী আছে।

"ইংরেজরা জানত যে, পালিয়ে গিয়ে বেঁচে থাকার উপায় আন্দামানে নেই বললেই চলে। তাই সেই সময়ে রাতের পাহারা তেমন কড়া ছিল না।

"সুযোগ বুঝে দুধনাথ আর তার বেশ ক'জন সাঙ্গোপাঙ্গ একদিন রাতে কৌশল করে জঙ্গলে পালাল।

প্রথম দু'দিন মুক্তির আনন্দে সবাই মেতে রইল। তারপর কয়েদখানা থেকে নিয়ে আসা খাবার, পানীয় জল ফুরিয়ে গেল। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে খাবার খুঁজে পায় না, শিকার করার হাতিয়ার নেই— ফলমূল খেয়ে কতদিন আর থাকা যায় ? তার ওপর আন্দামান জঙ্গলে বেঁচে থাকতে হলে যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাও তাদের ছিল না। মনে সবসময়েই ভয়, কখন আন্দামানিদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তা হলে তাদের তীর খেয়ে মরতে হবে।

"দু-একদিনের মধ্যেই এক রাত্রে তাদের একজনকে সাপে কামড়াল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো গেল না।

"তারপর শুরু হল জলকষ্ট। অনেক চেষ্টা করে যদি বা কোথাও ঝরনা মেলে, তার ধারে আন্দামানিদের যাতায়াতের চিহ্ন দেখতে পেয়ে সেখান থেকে পালাতে হয়।

"আন্দামানের আবহাওয়া কোনও নিয়ম মেনে চলে না। হঠাৎ খুব বৃষ্টি এসে সব ভিজিয়ে দিয়ে চলে যায়, আবার পরমুহূর্তেই সব শুকিয়ে যায়। দুধনাথের দল জলে ভেজে, গায়েই তাদের সে জল শুকোয়।

"পোকামাকড়, মশার দৌরাত্ম্যও খুব বেশি। এক-একটা পোকা এতই বিষাক্ত যে, তার কামড়ে সারা শরীর জ্বলতে থাকে। ভিজে আবহাওয়া, অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় বেশ ক'জন কয়েদি বেদম জ্বরে পড়ল। তাদের ফেলে রেখে যাওয়া শক্ত, আবার তাদের জন্য বসে থাকাও মুশকিল। খাবারের অভাবে শরীর যেমন দুর্বল, তাতে এই পরিশ্রম আর সহ্য করা যায় না।

"এইরকম অবস্থায় প্রায় পাগল হয়ে বেশ ক'জন কয়েদি ফিরে আবার ইংরেজদের কাছে ধরা দেওয়ার জন্য দল ছেড়ে রওনা দিল। ওই জঙ্গলে পথ চিনে ফিরে যাওয়া কি মুখের কথা ? তাদের অবস্থা কী হল, কেউ জানল না।

"দুধনাথ আর তার ক'জন সঙ্গী কিন্তু ফিরল না। তারা ওই ভয়াবহ জঙ্গলে ফলমূলের খোঁজে ফেরে, রাতে কোনও গাছের ডালে অথবা বিরাট গাছের তলায় আশ্রয় নেয়, আর মনে-মনে ভাবে হয়তো এবার ভাগ্য মুখ তুলে তাকাবে।

"এইভাবে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে-করতে দিন কাটে। এর মধ্যে আরও কয়েকজন খুব অসুস্থ হয়ে মারা পড়ল।

"দুধনাথ আর তার দুই সঙ্গী প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। কয়েদে ফেরার কথা ভাবে, কিন্তু এতদিন পরে পথ খুঁজে ফিরে যাওয়াও আর সম্ভব নয়।

"এইরকম অবস্থায় একদিন বিকেলবেলায় তিনজনে গাছতলায় বসে বুনো ফল খাচ্ছে, এমন সময় যা দেখল তাতে ফল আর মুখে উঠল না।

"তাদের খুব কাছেই তীর-ধনুক হাতে ছ'শোজন আন্দামানি গাছের আড়াল থেকে তাদের দেখছে।

"সেই দৃশ্য দেখে ভয়ে তাদের শরীর হিম হয়ে গেল। কিছু বোঝাবার আগেই দুধনাথের দুই সঙ্গী ফলমূল ফেলে মারল দৌড়। কিন্তু দৌড়বে কোথায়, তীরের চেয়ে তো জোরে ছোটা যায় না। দুধনাথের চোখের সামনে ঝোঁ করে দুটি তীর ছুটে গিয়ে দু'জনের পিঠে বিঁধল। দু'জনে মুখ থুবড়ে পড়ল।"

"এই দৃশ্য দেখে দুধনাথ জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখে সেই আন্দামানিরা তাকে ঘিরে তখনও দাঁড়িয়ে আছে। দুধনাথ অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে রইল। আন্দামানিদের নড়বার কোনও লক্ষণ নেই। ধীরে-ধীরে দুধনাথ উঠে বসল। এবার নিশ্চয় আন্দামানিরা ওকে মেরে ফেলবে। সারা শরীর কেমন অবশ হয়ে এল। দুধনাথ মনে ভাবতে লাগল, যা হওয়ার তাড়াতাড়ি হয়ে গেলেই পারে।

"কই, আন্দামানিরা তো তীর-ধনুক তুলছে না। সাহস করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, একটু দূরে তার দুই সঙ্গী হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। তাদের শরীরে প্রাণের কোনও লক্ষণ নেই। দুধনাথ জানত

যে, আন্দামানিরা তীরের ডগায় বিষ ব্যবহার করে। তাই ওদের ওই অবস্থা।

"একবার ভাবল, উঠে দৌড় মারবে। কোনও লাভ নেই। তার শরীরে দৌড়বার শক্তিও নেই। তা ছাড়া পালাবেই বা কোথায় ?

"আন্দামানিদের মধ্যে দু'জন তার কাছে এগিয়ে এল। দুধনাথের বুকের ভেতর তখন হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে। ওই অবস্থায়ও দুধনাথের একটু হাসি পেল। মানুষের প্রাণের এতই মায়া !

"আন্দামানি দুটি হাত-পা নেড়ে দুধনাথকে কী যেন সব বলল। দুধনাথ ওদের কথা কিছুই না বুঝে ফ্যালফ্যাল করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল।

"দু'জনের মধ্যে একজন আন্দামানি অন্যদের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলল। তাদের মধ্যে একজন গিয়ে বনের ভেতর থেকে একটা লতা কেটে আনল। তিনজনে মিলে সেই লতা দিয়ে দুধনাথের হাতদুটো কষে বাঁধল। তারপর তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে টানতে-টানতে নিয়ে চলল। দুধনাথ শেষবারের মতো একবার তার সঙ্গীদের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে দেখে টলতে-টলতে আন্দামানিদের সঙ্গে চলল। তার পা আর এগোতে চায় না। কোনও কিছু ভাববার ক্ষমতাও নেই।

"বেশ কিছুটা হাঁটার পর জঙ্গলটা একটু হালকা হয়ে এল। দুধনাথ দেখল, সেই ফাঁকা জায়গায় বেশ বড়সড় একটা পাতার কুটির। কুটিরটা একটা বিরাট ছাতার মতো দেখতে, যার চারদিকটা প্রায় মাটি পর্যন্ত নেমে এসেছে। আন্দামানিরা তাকে সেই কুটিরের ভেতরে নিয়ে গেল। এক ধারে দুধনাথকে ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিল।

"সঙ্গে-সঙ্গে আন্দামানিদের ছেলে, বুড়ো, মেয়েরা তাকে ঘিরে ধরল। হাত-পা নেড়ে, অঙ্গভঙ্গি করে তারা যে কীসব বলতে লাগল, দুধনাথ তার এক বর্ণও বুঝল না। মেয়েরা তো তাকে দেখে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। কেউ কেউ আবার তার গায়ে খোঁচা মারে, কাপড়টা নেড়েচেড়ে দেখে, চুলে হাত দেয়— সে এক কাণ্ড।

"কুটিরের বাইরে তখন অন্ধকার নেমে আসছে। কুটিরের মাঝখানে অনেক পাত্রে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। সেই আধো আলো আধো অন্ধকারে দুধনাথ বসে-বসে তার চারধারে আন্দামানিদের দেখতে লাগল। কারও গায়ে কাপড় নেই, রং কালো, মাথায় কোঁকড়া চুল, বেঁটেখাটো অদ্ভুত সব চেহারা। দুধনাথ একবার ভাবল, হয়তো সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছে। নড়েচড়ে, চোখ পিটপিট করে বুঝল যে, সে বেশ সজাগ।

"তারপর হঠাৎ সেই ভিড় ঠেলে দু'জন ষণ্ডা চেহারার পুরুষ তার কাছে এগিয়ে এল। দুধনাথ ভাবল, এই বুঝি তার শেষ।

"আন্দামানের পুরুষ দুটির কথায় একটি মেয়ে গিয়ে দুধনাথের জন্য কিছু খাবার এনে দিল। সাধারণ অবস্থায় হয়তো দুধনাথ সে খাবার মুখেও দিতে পারত না। সেদ্ধ মাছ, ফল আর মধু। মাছে আবার একটুও নুন নেই, এরা নুন ব্যবহার করে না।

"খিদের মুখে দুধনাথ ওই খাবার হাত-বাঁধা অবস্থাতেই কোনওমতে গিলল— আন্দামানিরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তার খাওয়া দেখতে লাগল।

"কিছুক্ষণের মধ্যে আন্দামানিরা একে-একে যে যার নিজেদের কাজে ফিরে গেল। তখন ক্লান্তিতে, ঘুমে দুধনাথ আর চোখ খোলা রাখতে পারছে না। ওখানে শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

"পরদিন সকালে যখন দুধনাথের ঘুম ভাঙল, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। রাত্রের বিশ্রামে সে বেশ সুস্থ বোধ করছে। তাকে উঠে বসতে দেখে দু'জন আন্দামানি তার দিকে এগিয়ে এল। তখনও দুধনাথের প্রাণের ভয় যায়নি। সে ভয়ে-ভয়ে তাদের গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল।

"আন্দমানি দু'জন এসে তার হাতের বাঁধন খুলে দিল। এইবার দুধনাথ বুঝল যে, আন্দামানিরা তাকে মেরে ফেলতে চায়। চারদিক দেখার সুযোগ পেয়ে সে ব্যবস্থাটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করল।

"কুটিরের ছাউনির ফাঁক দিয়ে বেশ আলো ভেতরে আসে। ঢোকা বেরনোর দরজা অথবা উঁচু ফাঁক দু'ধারে দুটো। বিরাট ছাতার মতো কুটিরটার চারদিকে এক-একটি পরিবারের থাকবার, শোয়ার জায়গা। মাঝখানটাতে তাদের জিনিসপত্র, আগুন, জল, টুকিটাকি কত কী রাখা আছে। দেখে বোঝা যায় যে, প্রায় বিশ-বাইশটি পরিবার এই কুটিরে একসঙ্গে বাস করে।

"একটি পুরুষ এসে দুধনাথকে অনেক কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু দুধনাথ কিছুই বুঝল না। তার ভাবগতিক দেখে আন্দামানি তাকে দাঁড় করিয়ে দিল, ইশারায় অনুসরণ করতে বলে সে নিজে কুটিরের বাইরে বেরিয়ে গেল। দুধনাথ তার পিছু-পিছু বাইরে বেরিয়ে এল।

"কী সুন্দর সকাল। ঝকঝকে রোদ, ঠাণ্ডা বাতাস, দুধনাথের সারা শরীর জুড়িয়ে গেল। আন্দামানিকে অনুসরণ করে কিছুটা গিয়ে তারা একটা ঝরনার ধারে পৌঁছল। সেই ঝরনার জলের স্পর্শে দুধনাথের শরীরের সব ক্লান্তি মুছে গেল।

"তার চলাফেরায় আন্দামানিরা আপত্তি করছে না। কুটিরে ফিরে একটা গাছের ছায়ায় দুধনাথ বসল। কুটিরটাকে ঘিরে বেশ কিছুটা জায়গা ফাঁকা। সেই ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়েই ঘন জঙ্গলের শুরু। এক-একটা গাছ কী বিরাট। আকাশে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে হাজার বছর ধরে এই আন্দামানিদের ছায়া দিচ্ছে।

"দুটি আন্দামানি মেয়ে পাতায় করে কীসব ফলমূল আর পরিষ্কার নারকেল মালায় কিছুটা মধু এনে দিল। আরাম করে দুধনাথ সেসব খেয়ে নিল। মেয়ে দুটি খিলখিল করে হাসে, আর হাত-পা নেড়ে কত কী বলে যায়। দুধনাথ অবাক হয়ে প্রকৃতির দুই কন্যার চলাফেরা, ধরনধারণ দেখতে লাগল।

"এইভাবে দুধনাথ আন্দামানিদের আশ্রয় পেয়ে গেল। এরা যে অযথা ক্ষতি করে না, বা তারা যে হিংস্র একেবারেই নয়, এটা ক'দিনের মধ্যেই দুধনাথ স্পষ্ট বুঝতে পারল।

"প্রথম তিন-চার মাস আন্দামানিরা দুধনাথকে কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখত। এরা সমুদ্রপারের মানুষদের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছে, তাতে তাদের বিশ্বাস করার কোনও কারণ ছিল না। সমুদ্রপারের মানুষরা এসে তাদের রাজত্বের বন কেটে তছনছ করেছে। বাধা দিতে গেলে আগুনের অস্ত্র দিয়ে তাদের মেরে ফেলেছে। তাদের সম্পদ লুট করেছে। এইরকম আরও কত ক্ষতি তারা করেছে, আজও করছে। সেইজন্য ওদের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া চাই। দুধনাথ তো তাদেরই একজন।

"'যে দুটি মেয়ে প্রথমদিন তাকে খাবার এনে দিয়েছিল, তারা কিন্তু প্রথম থেকেই দুধনাথকে বিশ্বাস করে নিয়েছিল। ওই দু'জনই তার দেখাশোনা করত, সময়মতো খাবার এনে দিত, তার যা দরকার সব কাজই করে দিত।

"এইভাবে মাসের পর মাস কাটে। ধীরে-ধীরে আন্দামানিরা দুধনাথকে সন্দেহ করাও ছেড়ে দিল। দুধনাথ ওদেরই একজন হয়ে গেল।

"দুধনাথও দিনে-দিনে আন্দামানিদের ধরনধারণ সব বুঝতে শুরু করল। তাদের ডাকাও মোটামুটি শিখে নিল। যদিও আন্দামানি পুরুষদের মতো শিকার করা বা অন্যান্য কাজে হাত লাগানোর সে চেষ্টাই করত না। বসে-বসে যখন দিব্যি খাওয়া জুটে যাচ্ছে তখন কষ্ট করার দরকার কী ?

"সবাই দুধনাথকে 'মায়ে' বলে ডাকত। বয়স্ক পুরুষদের তারা মায়ে বলেই সম্বোধন করত।

ছবি : নির্মলেন্দু মণ্ডল

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

(২০ পাতার পর)

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

শব্দদূষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৭০ সালের ৬ নভেম্বর মারা গেলেন। আমি যখন সিটি কলেজে পড়তাম, উনি আমাদের বাংলা পড়াতেন। বিভূতি চৌধুরী, বিনয় সরকারের মতো দিকপালরা থাকলেও নারায়ণবাবু ছিলেন ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। যেমন চেহারা, তেমনই মন টেনে-নেওয়া বাচনভঙ্গি। একবার কলেজের ল্যাবরেটরি নিয়ে গণ্ডগোল হল। '৫৩-'৫৪ সালের কথা। ছাত্ররা একদিন নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর ধর্মঘট করবে বলে জানাল। কর্তৃপক্ষ আমাদের আটকে রাখতে পরপর তিনটে ক্লাস করাবার দায়িত্ব দিলেন নারায়ণবাবুকে। সত্যিই আমাদের ক্লাসের একজনও শেষ পর্যন্ত ওই ধর্মঘটে শামিল হতে পারেনি।

নারায়ণবাবু 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক 'সুনন্দর জার্নাল' লিখতে-লিখতে মারা যান। প্রকাশিত শেষ কিস্তিতে মূল্যবোধের চরম অভাব, সামাজিক অবক্ষয়ের কথা বারবার লিখেছেন। কীভাবে তারস্বরে কালীপুজোর মাইক বাজছে, মাথাব্যথা কমাতে ওষুধ খাচ্ছেন—তার বর্ণনা দিয়েছেন। লিখেছেন, এটা যখন প্রকাশ হবে আমি না-ও থাকতে পারি এবং সত্যিই এর ঠিক পরেই উনি চলে গেলেন চিরকালের মতো।

হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠিত বিচারপতি হিসেবে অনেক রায় দিয়েছি। আমার মনের এক কোণে কিন্তু থেকে গিয়েছে সারের সেই হতাশার কথা। '৯৫ সালে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করে বলে, পুলিশ নাকি তাদের অনুষ্ঠানে মাইক বাজাতে বাধা দিচ্ছে। আমি ভাবলাম, এই সুযোগ। যেভাবেই হোক বন্ধ করতে হবে মাইকের 'অমায়িক' দৌরাত্ম্য। দিনরাত গাঁক-গাঁক করে মাইক বাজবে, তা তো হতে পারে না। অথচ বিদেশি আইনের বই ঘেঁটেও মাইক বন্ধের সেরকম জোরালো রায় পেলাম না। বরং আমেরিকার একটি কেসে তো রায় দেওয়া হয়েছিল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাত্রীদের বাসে বাজানো গান শুনতে হবে। আমাদের সংবিধানে ১৯ (১ক) ধারাতেও ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। তবু হাল ছাড়লাম না। '৯৬-এর ১ এপ্রিল মাইকের শব্দ নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিলাম। তুমুল হইচই হল। সারা পৃথিবীতে মাইকের আওয়াজ নিয়ন্ত্রণের ফতোয়া এই প্রথম। সে-বছর জুন মাসে

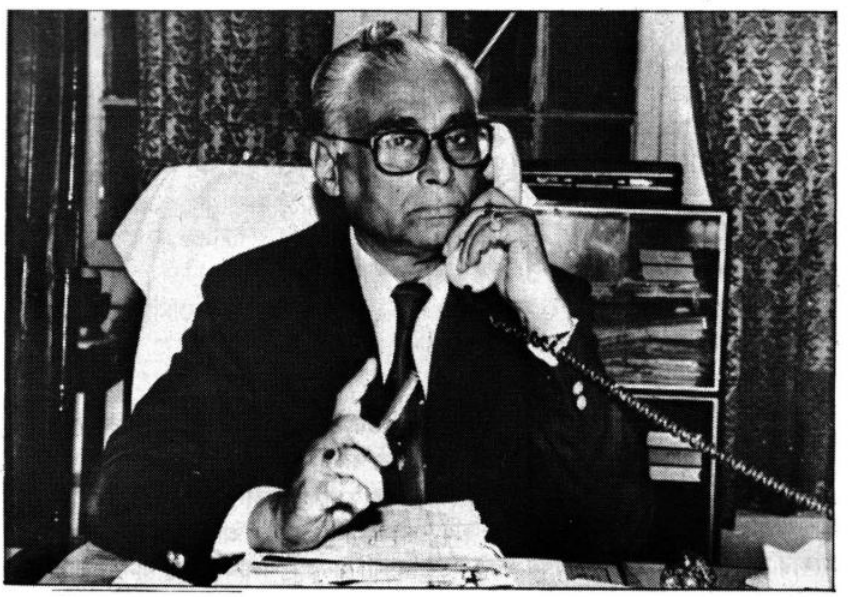

প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ফোটো : কিশোর রায়চৌধুরী

লন্ডনের 'হাউস অব কমন্‌স'-এও পাশ হল শব্দ-আইন। ভারতের ১৯টি হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করল আমার সংশ্লিষ্ট রায়। নড়েচড়ে বসল কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, পুলিশ, প্রশাসন। আমার ৩৬ বছরের পেশায় এই দারুণ সাফল্য কিন্তু এনে দিয়েছে 'সুনন্দর জার্নাল'-এ বর্ণিত সারের সেই ক্ষোভই। বিষয়টি ওখানেই থেমে থাকেনি। এর পর শব্দবাজির ব্যবহার বন্ধেও রায় দিয়েছি। বহু বাধা পেরোতে হয়েছে। কিন্তু '৯৭-এর ২৬ সেপ্টেম্বর দেওয়া আমার রায়ের পর 'এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন রুল্‌স, ১৯৮৬' পরিমার্জনা করতে হয়েছিল। এসব নিয়ে বহু লেখালেখি, বিতর্ক হয়েছে। সাধারণ মানুষ স্বাগত জানিয়েছেন আমার সাহসকে।

একটি নামী বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে ৯০৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা এক্সাইজ ডিউটি ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। হাইকোর্টে তাদের হয়ে দেশের নামজাদা চার-পাঁচজন বিশেষজ্ঞ সওয়াল করেন, তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করে আমি ওই সংস্থাকেই দোষী বলে রায় দিই (ম্যাটার নম্বর ৩২৫৬/১৯৮৭)। হাইকোর্টে অর্থনীতিবিষয়ক এই ধরনের বড় রায় আর কোথাও হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তবে আরও তৃপ্তি পেয়েছি জীবনের শেষ পর্যায়ের একটি রায়ে। মাস কয়েক আগে লেকে সেনাবাহিনীর মর্টার মাথায় পড়ায় মারা যান শঙ্খশুভ্র সেনগুপ্ত। প্রথমদিকে তো প্রতিরক্ষামন্ত্রক কোনও গুরুত্ব দিচ্ছিল না। এই মামলা সেনা-আদালতে হবে না বাইরে, তা নিয়েও উঠেছিল বিতর্ক। পুলিশও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জোরালো ব্যবস্থা নিতে

ইতস্তত করছিল। শঙ্খশুভ্রর স্ত্রী তখন অসুস্থ। আমি বিবেকের তাড়নায় 'সুয়ো মোটো' মামলা করলাম। বেঙ্গল রোয়িং ক্লাবকে বাধ্য করালাম সেনগুপ্ত পরিবারকে সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে। সেনামন্ত্রক বাধ্য হলেন শঙ্খশুভ্রর স্ত্রীকে বালিগঞ্জের শিবিরে শিক্ষিকার চাকরি দিতে। এ ছাড়াও তাঁর জীবনে অর্থনৈতিক কোনও বাধা যেন না আসে, সে কারণে আরও চারটি বিশেষ সুযোগ দিতে বাধ্য হল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এই রকম 'রিহ্যাবিলিটারি জাস্টিস' আমাদের দেশে বিরল।

গত ১৩ অগস্ট কলকাতা হাইকোর্টে ছিল আমার শেষ কর্মদিবস। এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে আমাদের বাগানের মালীরা আমাকে বটগাছের একটা বনসাই উপহার দিলেন। বললেন, পরিবেশ বাঁচাতে আপনি গাছ কাটা নিষিদ্ধ করার রায় দিয়েছেন। শব্দদূষণ বন্ধে এয়ারহর্ন, মাইক, বাজি এসবের আওয়াজ নিয়ন্ত্রণে পথ দেখিয়েছেন। এই সবুজ বটগাছই আপনার কাজের স্বীকৃতি হতে পারে। বটগাছটি আমি রেখে দিয়েছি সযত্নে। শেষ দিন বেরিয়ে আসছি হাইকোর্ট থেকে, বাবাও হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। সেই সুবাদে '৫৮ সাল থেকে হাইকোর্টে নিয়মিত যেতাম। প্রথমে অবশ্য ছাত্র হিসেবে। '৬২ থেকে আমি স্বীকৃতি আইনজীবী। পরিচিতি নেহাত কম নয়। বাড়ি ফেরার জন্য গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি শেষ দিন। এক ভদ্রলোক পাশে এসে বললেন, বেহালার সেনগুপ্ত পরিবারের লোক আমি। আজই, একটু আগেই শঙ্খশুভ্রর স্ত্রীর ছেলে হয়েছে।

উত্তর দেওয়ার তাৎক্ষণিক ভাষা খুঁজে পাইনি আমি। সব আত্মীয় হয়তো খবরও পাননি। সেনগুপ্ত পরিবার কিন্তু গোড়াতেই আমাকে নবজাতকের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ জানাতে ভোলেনি। হাইকোর্টে লোক পাঠিয়ে খবরটা জানিয়েছে। প্রসন্ন মনে আমি বাড়ি ফিরলাম।

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

ব্যাগে ভালুকছানা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি কলকাতার রাস্তায়

শানু লাহিড়ী

আমার শিল্পীজীবনের ৫০ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতারই না মুখোমুখি হতে হয়েছে। ছবি আঁকার ফাঁকে-ফাঁকে নিজেকে যখন একটু একা করে নিতে পারি, তখন সেসব কথা ভাবতে ভাল লাগে। নিজেকে উন্নয়নের নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছি। কলকাতাকে সুন্দর করে তোলার আন্দোলনে আমি দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। '৮৪ সাল থেকে কলকাতার দেওয়াল পরিষ্কার রাখার জন্য চেষ্টা করেছি। পরিষ্কার দেওয়ালে এঁকে দিয়েছি মহাপুরুষদের ছবি। ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে তৈরি করে দিয়েছি 'পরমা'র মূর্তি।

যাঁদের ছবি দেখা আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা, তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর, নীরদ মজুমদার, মাতিস, পিকাসো, শাগাল ও ব্রাক। প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজন্তু ছিল ছেলেবেলা থেকেই আমার পছন্দের। সারাজীবনে কতরকম জীবজন্তুই যে পুষেছি আমি! আর তাদের নিয়ে জীবনের সব বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি! একবারের কথা বলি। আমরা তখন গুয়াহাটিতে থাকি। শিলং থেকে মফলং যাওয়ার পথে দেখি বানর বিক্রি হচ্ছে। আমি পাঁচ টাকা দিয়ে একটা বানর কিনলাম। ছোট্ট বানর। সারা গায়ে ছাইরঙা লোম। চোখদুটো আশ্চর্য উজ্জ্বল। শিলং থেকে গুয়াহাটি ফেরার সময় গাড়ির দরজার মুখে বসিয়ে তাকে নিয়ে এলাম বাড়িতে। বাড়ির চারপাশ দেখেশুনে তার কেন জানি না ভাল লেগে গেল। দিব্যি পোষ মানল। তার নাম দিয়েছিলাম 'হরিদাস'। আমি তাকে নাম ধরে ডাকলেই সে ছুটে আসত কাছে। আমাকে আদর করত। কিন্তু আমার মেয়ে দোদো যখনই তার কাছে যেত, হরিদাস লাফিয়ে উঠে চুল ধরে টানাটানি করত, নাক, কান কামড়ে দিত। আমার ছেলে পমকে দেখলেই সে তার মাথার ওপরে উঠে বসে থাকত চুপচাপ। আমাদের একতলায় কিথ বলে একটি মেয়ে ছিল, তাকেও হরিদাস ভয় পেত না। একটু বড় হয়ে প্রায়ই সে চেন খুলে পাড়া বেড়াতে বেরিয়ে পড়ত।

একদিন এক মজার কাণ্ড হল। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি হরিদাস উধাও। আমরা সকলে মিলে এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম। কোথাও হরিদাসকে পাওয়া গেল না। সারাদিন খুঁজে-খুঁজে আমরা হয়রান। শেষে মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সারাদিন যেখানেই কাটাক, বিকেলে হরিদাসকে খাওয়ার জন্য এ-বাড়ি আসতেই হবে। তাই খাওয়ার ঘরটা ভাল করে সাজালাম। খাওয়ার টেবিলে আনারস, বাতাবি লেবু, আপেল, কলা, পাকা পেঁপে থরে-থরে সাজিয়ে রাখা হল। ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিলাম কিছু পাকা কুল। সবাই খাওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে শোয়ার ঘরে বসে হরিদাসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। একসময় জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ও এসে খাবার টেবিলে ফলগুলো টিপে-টিপে খাচ্ছে।

আমি আস্তে-আস্তে ঘরে ঢুকলাম। দেখি হরিদাস দরজার ওপরে বসে আছে। ফ্রিজ থেকে বের করে আমি একটা-দুটো কুল খেতে লাগলাম। তারপর ওপরদিকে হাত বাড়াতেই ও ছুটে এল। সঙ্গে-সঙ্গে ধরে ফেলি। তারপর চলে চেন দিয়ে বাঁধাবাঁধি। তখন আমার ছেলেমেয়ের সে কী হইচই! ইতিমধ্যে হরিদাস আমার যথেষ্ট ক্ষতি

করেছে। বাড়িতে শিল্পীদের দেওয়া নানা শৌখিন উপহার এখানে-ওখানে ছুড়ে ভেঙে ফেলেছে টুকরো টুকরো করে। কত ভাল-ভাল ছবি নষ্ট করে দিয়েছে। যে বাড়িতেই পালিয়ে গিয়ে বসত, সেখানে হুল্লোড়বাজিতে সে ছিল ওস্তাদ। বাচ্চাদের মেরেধরে, জিনিসপত্র তছনছ করে সে পালিয়ে আসত। তাই শেষপর্যন্ত হরিদাসকে অন্য একজনের কাছে চালান করে দিলাম। বাড়িতে শান্তি ফিরে এল।

আর একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। সেটা '৫০-'৫১ সালের কথা। আমার সবে বিয়ে হয়েছে। আমায় অবাক করে দিয়ে আমার স্বামী একদিন একটা ছোট্ট ভালুকছানা আমায় উপহার দিলেন। একমাস মোটে বয়স তার। থপথপ করে হাঁটে। টি. ডব্লিউ.এ-র ব্যাগে পুরে তাকে নিয়ে আমি সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াতাম। অনেক সময় আমার সঙ্গে লুকনো ভালুকছানা দেখে ট্রাম-বাসের কন্ডাকটররা আমাকে নামিয়ে দিতেন। তখন তাকে আদর করতে-করতে রাস্তা দিয়ে হাঁটতাম। আমি তখন কমলা গার্লস স্কুলে মেয়েদের ছবি আঁকা শেখাই। একদিন আমাদের স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল প্রণতি দে (কবি বিষ্ণু দের স্ত্রী) বললেন, 'শানু তোমার ভালুকছানাটাকে নিয়ে আসবে, আমার মেয়েদের দেখাব।' কয়েকদিন বাদে সত্যি-সত্যি নিয়ে গেলাম ভালুকছানাটাকে। আর তাকে নিয়ে সারা স্কুলের মেয়েদের মধ্যে সে কী হইচই। রাতে শোয়ার সময় ভালুকটা আমার খাটের পাশে বাস্কেটের মধ্যে ঘুমোত। ওকে কখনও আমরা গলায় চেন দিয়ে রাখিনি। স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াত। তিন-চার মাস পরে ভালুকটা বেশ বড়সড় হয়ে উঠল। ওকে দেখে ছোটরা ভয় পেতে লাগল।
তখন আমার স্বামী তাঁর এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বন্ধুকে ভালুকটা দিয়ে দিলেন, তাঁদের ইলিয়ট রোডের বাড়িতে। কয়েক মাস পরে শুনলাম আমাদের সেই পোষা ভালুকটা গলায় চেনের ফাঁস লেগে মারা গেছে। এত মনখারাপ হয়ে গেল!

বিদেশে বিভিন্ন শিল্পীদের ছবি চুরি, ছবির হাত বদল, নানা অবৈধ উপায়ে বিক্রির গল্প শুনেছি। আমার জীবনেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল। আমি তখন গুয়াহাটিতে থাকি। সেখানকার আর্মি থেকে দুটো ছবি আঁকার নির্দেশ পাই। তাদের ক্লাবঘরে টাঙানোর জন্য। একটি এঁকেছিলাম, যুদ্ধের দৃশ্য।

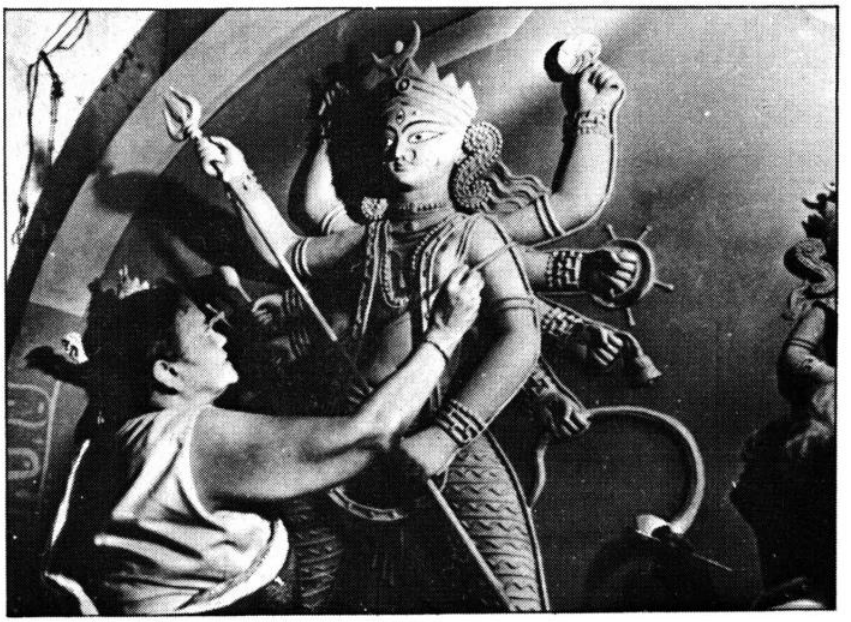

দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করছেন শিল্পী শানু লাহিড়ী ফোটো : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্যটি বড় এক রেস্তরাঁর। সে ছবিগুলো ওরা এসে নিয়ে যায়। বছর দুয়েক পরে আর্মির একজন কর্তাব্যক্তি এসেছিলেন গুয়াহাটিতে। তিনি আমার ছবি দেখে বললেন, "আমাদের একটা ছবি দিন না আপনার।"

আমি বললাম, "বা রে, ক' বছর আগেই তো আমি ছবি করে দিয়েছি।" তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। সঙ্গে-সঙ্গে খোঁজ পড়ল ছবিটার। প্রায় ছ'মাস খোঁজ করে ছবির সন্ধান পাওয়া গেল। দেখা গেল, একজন জওয়ান রেস্তরাঁর ছবিটা এক পানওয়ালাকে বিক্রি করে দিয়েছে। সে ছবিটা দু' টুকরো করে কেটে দু'দিকে সাজিয়ে রেখেছে। যে এই অপকর্ম করেছে সেই জওয়ানেরও সন্ধান পাওয়া গেল। তার 'কোর্ট মার্শাল' হল। সেই ছবিটি সারানোর জন্য আমার কাছে ফেরত এসেছিল। সেটি জুড়ে নতুন করে রং দিয়ে ছবিটা সারালাম। এবং তারপর সেটি উপহার দিলাম গুয়াহাটির প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার দফতরকে।

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

ছোট্ট সেই কুকুরছানাটার কথা আজও ভুলতে পারিনি

নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়

অনেকের কাছে এটা হয়তো কোনও ঘটনাই নয়, কিন্তু আমার কাছে জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা বলতে ওই ঘটনাটির কথাই বারবার মনে পড়ে যায়। আজ যে আমি সিনেমা তৈরি করি, সেলুলয়েডের পরদায় মানুষে-মানুষে সম্পর্কের কথা তুলে ধরতে চেষ্টা করি, সেই বোধটাই আমার তৈরি হয়েছিল ছেলেবেলার ওই ঘটনাটা থেকে।
আমার তখন সাত-আট বছর বয়স। বাবার সঙ্গে কলকাতার বেলগাছিয়া পশু হাসপাতালের কোয়ার্টারে থাকি। আমার বাবা, নারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নামকরা পশুচিকিৎসক। বাবার বদলির

চাকরি ছিল বলে ছেলেবেলায় আমার অনেক জায়গায় ঘোরার সুযোগ হয়েছে। সেই সময় বাবা বেলগাছিয়ার পশু হাসপাতালের ঘোড়ার চিকিৎসা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমরা ছ'ভাইবোনই বাবার কোলে-পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছি। তিনিই ছিলেন আমাদের সব, কারণ খুব ছেলেবেলায় আমাদের মা মারা যান। আমার যখন মাত্র ১১ মাস বয়স, তখনই মাকে হারাই। তাই আমার কাছে বাবাই ছিলেন জীবনের সবকিছু। রোজ রাতে বাবার পাশে শুয়ে গল্প না শুনলে ঘুমই আসত না। এখনও মনে আছে, রাতের বেলায় মাঝে-মাঝে বাবাকে ডাকতে লোক আসত। কারও বাড়ির কুকুর কিংবা কারও বাড়ির বেড়াল অসুস্থ হয়ে পড়েছে, চিকিৎসার জন্য ডাক পড়ত বাবার।

এইরকমই একদিন 'কল' পেয়ে বাবা বেরিয়ে গেছেন, আমি বিছানায় শুয়ে অপেক্ষা করছি কখন বাবা বাড়ি ফিরবেন। অনেক রাত হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত ভোর চারটে নাগাদ বাবা বাড়ি ফিরলেন। সঙ্গে ছোট্ট একটা কুকুরছানা। সে বেচারি ভারী অসুস্থ। বাবা তাই তাকে চিকিৎসার জন্য বাড়িতেই নিয়ে এসেছেন। ছোট্ট পুঁচকে একটা কুকুর, তারপর কিছুদিন আমাদের বাড়িতেই থাকল। প্রথম ক'দিন সে একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। কিছুই খায়দায় না, শুধু মাঝে-মাঝে কুঁই-কুঁই করে। বাবার ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠল ওই কুকুরছানাটা। দিন নেই রাত নেই তিনি পড়ে আছেন কুকুরছানাটিকে নিয়ে। আমার প্রথমে একটু রাগই হয়েছিল ছানাটার ওপর। বাবার ওপর আমার যে অধিকার ছিল তাতে যেন বেশ কিছুটা ভাগ বসিয়েছিল ও। কিন্তু আস্তে-আস্তে ওর সঙ্গে আমারও একটা বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বাবা ওকে রোজ 'স্টেথোস্কোপ' দিয়ে পরীক্ষা করতেন, 'টেম্পারেচার' মাপা হত। আমিও সবসময় ওর কাছে-কাছে থাকতাম। সপ্তাহদু'য়েক বাদে কুকুরছানাটি আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর আরও কিছুদিন আমাদের বাড়িতে কাটিয়ে ও চলে গেল ওর মনিবের বাড়ি। কুকুরছানাটি চলে গেল বটে, কিন্তু আমাদের মনে একটা ফাঁকা জায়গা রেখে গেল। বিশেষ করে আমার মনে। কারণ, দুটি প্রাণীর মধ্যে কীভাবে সম্পর্ক তৈরি হয়, তা আমি প্রথম জানলাম। একটা মানুষ আর কুকুরের মধ্যে যে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তার তুলনা মেলা সত্যিই কঠিন।

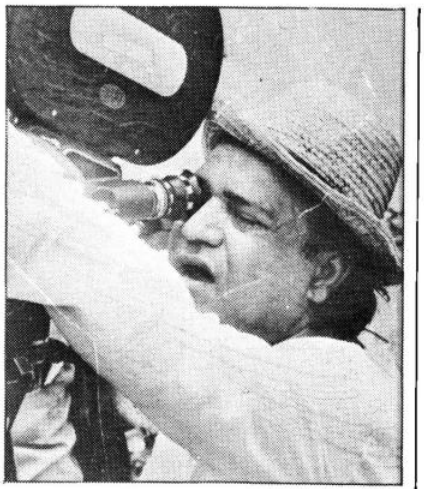

পরিচালক নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় ফোটো : রানা লোধ

পরে টের পেলাম এই সম্পর্কের প্রভাব পড়েছে ওই কুকুরছানাটির মধ্যেও। তারপরে রাস্তায় যখন আমরা বেরোতাম, হয়তো ও বেড়াতে বেরিয়েছে ওর মনিবের সঙ্গে, রাস্তায় দেখা হয়ে গেলেই আমাদের কাছে এসে একেবারে লাফঝাঁপ জুড়ে দিত। বাবা থাকলে তো আর রক্ষে নেই। ওর আহ্লাদের কোনও সীমা থাকত না। এখনও মনে আছে, বেলগাছিয়ায় থাকার সময় ভোরে আমি বাবার সঙ্গে হাঁটতে বেরোতাম। মাঝেমধ্যেই রাস্তায় কুকুরছানাটির সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। তখন অবশ্য ও আর ছানা নেই, রীতিমত বড় হয়ে গেছে। বাবাকে দেখলেই চেন ছাড়িয়ে একেবারে ছুট্টে চলে আসত। ওর সঙ্গে যে বন্ধুত্ব, ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, তা অবিশ্বাস্য! আমার জীবনে আজও সেই ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে। দুটি প্রাণীর মধ্যে যে কীভাবে ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি হয় তা আমি শিখেছিলাম।

আজ যখন চারদিকে এত অবিশ্বাস, এত ঝগড়া তখন বারবার ওর কথা মনে পড়ে যায়। ও আমাদের যেভাবে ভালবেসেছিল কিংবা আমরা যেভাবে ওই সাতদিন বয়সের কুকুরছানাটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম, তার আর কোনও তুলনা হয় না। সিনেমা তৈরি করে দেশে-বিদেশে অনেক সম্মান, অনেক পুরস্কার পেয়েছি, কিন্তু এই কুকুরছানাটার ভালবাসাই আমার কাছে আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

বাঘটাকে মারা যায়নি, তাই আনন্দ পেয়েছিলাম

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আমার ছেলেবেলাটাই ছিল নানারকম মজায় ভরা। সব সময় কিছু না কিছু ঘটনা ঘটতই। আর আমি নিজে ভীষণ দুষ্টু ছিলাম বলে আমি যা ঘটাতাম তা অন্যের কাছে মজার বিষয় হয়ে উঠত না। আমি প্রথম ইস্কুলে ভর্তি হই কাটিহারের একটা মাইনর স্কুলে। ক্লাস টু-তে। আমার একটি সহপাঠী জুটেছিল, যার নাম সুবল। এবং সে আমার মতোই দুষ্টু। তাকে দেখেছি খিদে পেলে মাটির ঢেলা তুলে চিবিয়ে খেয়ে ফেলত। সে কস্মিনকালেও পড়া পারত না। আমি বাড়িতে পড়া করে যেতাম। কিন্তু যেহেতু সুবল পড়া পারত না, সেইজন্য তার প্রতি সহানুভূতিবশত আমিও পড়া বলতাম না। ফলে বেঞ্চে দাঁড়ানো, বেত্রাঘাত ইত্যাদি সবরকম শাস্তি ভোগ করতে হত। আর ক্লাসের সবচেয়ে খারাপ ছেলেদের একজন হিসেবে আমার পরিচিতি ঘটে গেল। মাস্টারমশাইরা আমাকে পেছনের বেঞ্চে বসিয়ে রাখতেন। কিন্তু মুশকিল হল, সব পড়াই আমার মুখস্থ ছিল। কাজেই পরীক্ষার সময় আমি গড়গড় করে খাতায় সবই ঠিকঠাক লিখে দিতে পেরেছিলাম। পরীক্ষার ফল দেখে মাস্টারমশাইরা খুবই অবাক! কারণ নম্বরের বিচারে আমি ক্লাসে সেকেন্ড হয়েছি। অথচ সারা বছর আমি ক্লাসে

(এর পর ৬৬ পাতায়)

পুজোয় বেড়ানো

কথাকলির দেশে

কথাকলির মুদ্রা

কিংবদন্তি, ভাস্কর্য, কথাকলি নাচ, পাহাড়পর্বত, সমুদ্রসৈকত, শ্যামল অরণ্যানী সব মিলিয়ে চিত্ররূপময় কেরল। লিখেছেন তাপস রায়

কেরলের বিখ্যাত নৌকো বাইচ

একটি কিংবদন্তির কথা আমরা অনেকেই জানি। তা হল, ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করার পরে পরশুরাম তাঁর যুদ্ধ-কুঠার সমুদ্রের জলে ফেলে দেন। এর ফলে সমুদ্রের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। সাগরের জল শুকিয়ে যাওয়ায় সৃষ্টি হয়েছিল স্থলভাগের। এই নতুন স্থলভাগই আজ আমাদের কাছে 'কেরল' সঙ্গমযুগের তামিল পন্ডিত শিল্পোপ্পাদিকরমের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি, কুলশেখর যুগে (৮০০ থেকে ১১০২) হিন্দু ধর্মের বিকাশ ঘটে। তখন কেরলে বহু সুন্দর সুন্দর মন্দির গড়ে উঠেছিল। শুধুমাত্র মন্দিরই নয়, এই সময় থেকেই কেরলে নানা শিল্প ও নৃত্যকলার উদ্ভব হয়। রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী

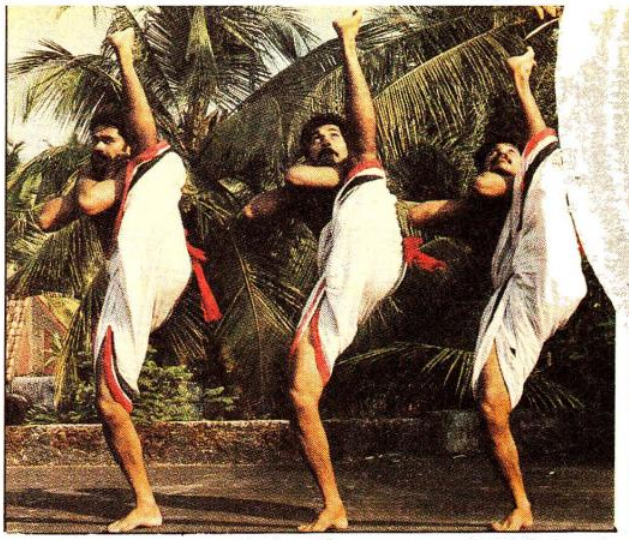

লোকনাট্য দেখতে পাওয়া যায় 'মর্শাল আর্ট'-এর প্রভাব ফোটো: উইলিয়াম রোড

নিয়ে কেরলের বিখ্যাত নৃত্য 'কথাকলি'র সূচনা এই সময়েই। কেরলে সমুদ্র ও অরণ্যের এক অপরূপ সম্মিলন আমাদের মোহিত করে দেয়। প্রায় ৫৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলে সেজন্য অনেক বন্দর দেখা যায়। হাতির দাঁত, টিক কাঠ, গোলমরিচ, আদা, এলাচ, লবঙ্গের মতো দামি ও দুষ্প্রাপ্য গাছের দেখা পাওয়া যায় সারা কেরল রাজ্যে।

ভারতবর্ষের সীমান্তে অবস্থিত এই রাজ্যটি বেড়ানোর পক্ষে আদর্শ। কেউ যদি পশ্চিমবঙ্গ থেকে সোজা কেরল যেতে চান ট্রেনে, তা হলে হাওড়া স্টেশন থেকে উঠে পড়ুন 'কোচিন এক্সপ্রেস'-এ। রাতের ট্রেন অন্ধকারের বুক চিরে প্রায় দু'টি দিন পর পৌঁছে দেবে কেরলে। আর কেউ যদি দক্ষিণের কয়েকটি জায়গা ঘুরে কেরলে ঢুকতে চান, তাও সম্ভব। যেমন, রামেশ্বরম থেকে কেরলের রাজধানী তিরুবনন্তপুরম বা ত্রিবান্দ্রম যাওয়া যায় দু'ভাবে। একটি দিক হল কন্যাকুমারী থেকে বাসে। অন্য উপায় হল, প্রথমে বাসে তুতিকোরিন, সেখান থেকে আবার কোচিন হয়ে ত্রিবান্দ্রম। কন্যাকুমারী হয়ে যাওয়াই সবচেয়ে ভাল। এতে খরচও বাঁচে, অবার সময়েরও সাশ্রয় হয়।

যেতে হবে ত্রিবান্দ্রম

কেরলের রাজধানী বলে ত্রিবান্দ্রম শহরে হোটেল প্রচুর। সব ধরনের হোটেলই আছে

নারকেল গাছে ঘেরা মনোরম সমুদ্রতট

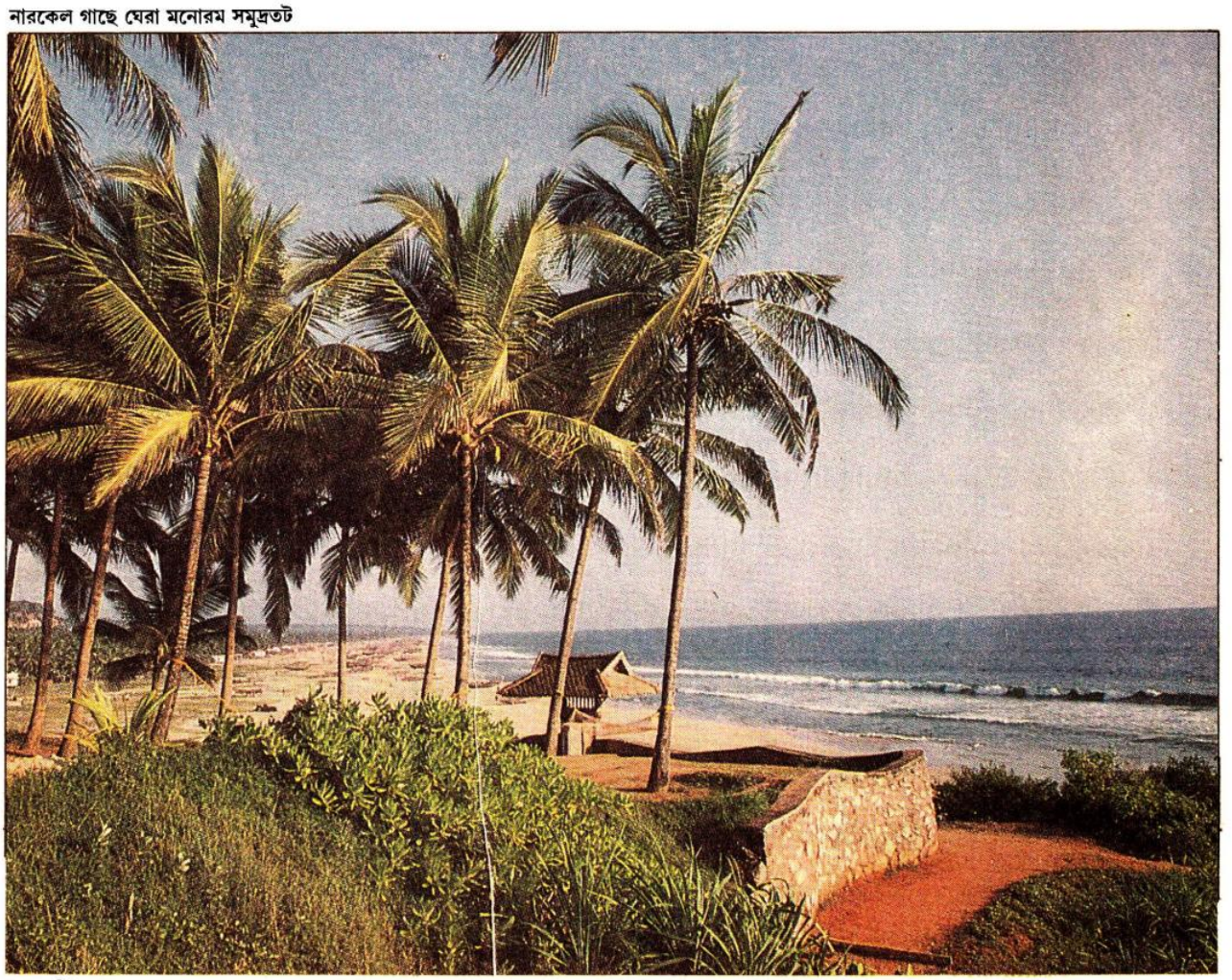

এখানে। দামি হোটেল যেমন অজস্র, শস্তার হোটেলও কম নেই।

ত্রিবান্দ্রম শহরের মূল দ্রষ্টব্য স্থানগুলি হল, পদ্মনাভস্বামী মন্দির, পার্ক ভিউ, শঙ্কুমুখম সৈকত, ভেলি টুরিস্ট ভিলেজ, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম।

পদ্মনাভস্বামী দেবতা হলেন বিষ্ণু। এখানে মন্দিরের ভেতর দেখা যায় অর্ধশায়িত দেবতার মাথার ওপরে অনন্তনাগ, পায়ের কাছে লক্ষ্মী। ৩৬৮টি পিলার সংবলিত মন্দিরের অলিন্দ। মন্দিরের লাগোয়া যে পদ্মতীর্থম সরোবরটি আছে, এটি সত্যিই দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

মোট ৬৪ একর জমির ওপর পার্ক ভিউ-এর বাগান। এই ঘেরা চত্বরে দেখা যায় আর্ট মিউজিয়াম, চিত্রা আর্ট গ্যালারি, ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম, চিত্রা এনক্লেভ ও কেসি পানিক্কর গ্যালারি। মাত্র পাঁচ টাকার টিকিট কেটে এই গ্যালারিগুলি ঘুরে দেখা যায়।

শঙ্কুমুখম সমুদ্রসৈকত ত্রিবান্দ্রম শহর থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরে। সমুদ্রের বালিয়াড়িতে এই সৈকতটি অত্যন্ত সুন্দর। এই সৈকতে খুব ভিড় হয় সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়। কারণ এখান থেকে যে সূর্যাস্ত দেখা যায়, তা অবর্ণনীয়, ভোলার নয়।

ভেলি টুরিস্ট ভিলেজে গেলে আমরা কেরলের বিখ্যাত ব্যাক ওয়াটারের যে গল্প জানি, তার স্বাদ পাওয়া যায়।এই ভিলেজে ব্যাক ওয়াটারে বোটিং-এর সুযোগ আছে। সেজন্য ত্রিবান্দ্রম গেলেই মানুষ ছোটেন ভেলি টুরিস্ট ভিলেজে। কারণ ত্রিবান্দ্রমের কাছে আর কোথাও ব্যাক ওয়াটারের দেখা সেভাবে পাওয়া যায় না।

সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম দেখতে যাওয়ার কথা বলব একটিই কারণে। তা হল বিজ্ঞান প্রযুক্তির নানা বিষয় এখানে সুন্দর-সুন্দর মডেলের মাধ্যমে দেখানো হয়। আমাদের বিজ্ঞানের বহু জটিল ব্যাপার বুঝতে সাহায্য করে। আরও একটি ব্যাপার, এই মিউজিয়াম আমাদের কলকাতার বিড়লা মিউজিয়ামের কথা মনে করিয়ে দেয়।

কো ভা ল মে সূ র্যা স্ত

ত্রিবান্দ্রম শহর থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরে যে সুন্দর সমুদ্র উপকূলটি আছে সেটি এখনও পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে সুন্দর সাগরবেলা বলে পরিচিত। আশা করি বোঝা যাচ্ছে আমি কোন সৈকতের কথা বলতে চাইছি। কোভালম সমুদ্রতট হল এককথায় এক অসাধারণ সুন্দর সাগরবেলা। কোভালম সমুদ্রতটের বালি কালো রঙের। কোভালমের সমুদ্রপারে দাঁড়িয়ে মানুষ প্রকৃতিকে আপন করে পেতে পারে। প্রকৃতির সঙ্গে এক আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি হবে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে সাগরের ধারে দাঁড়িয়ে মনে হবে যেন অন্য পারে চলে যাই। এখানে অস্তগামী সূর্য শেষ রশ্মি ছড়িয়ে দেয় সাগরের চলমান ঢেউয়ে। শান্ত ও নির্জনে কয়েকটা দিন এখানে অবশ্যই কাটিয়ে দেওয়া যায়। থাকার হোটেল এখানে অনেক। কেরল রাজ্য পর্যটনের কনডাকটেড টুরে ত্রিবান্দ্রম থেকে কোভালম বিচ ঘুরিয়ে নিয়ে আসা হয়।

ত্রিবান্দ্রম থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০০ ফুট উঁচুতে একটি পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস আছে। নাম পোনমুড়ি। এই জায়গাটি অবশ্যই ঘুরে দেখে আসা উচিত। এই জায়গাটির সৌন্দর্য ভোলার নয়।

এর পর শহর থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরে কুইলন ঘুরে আসা যায়। কুইলনে আটটি খাঁড়ি সহ অষ্টমুখি লেক আছে। কাজুবাদামের কারখানা দেখতে পাওয়া যায়। কাজুবাদামের কারখানা আছে বলেই বোধ হয় কুইলনে কাজুর দাম শস্তা।

চাঁ দ নি রা তে নৌ কো য়

ত্রিবান্দ্রম শহর থেকে ১৪৭ কিলোমিটার দূরে আলেপ্পি নামে যে জায়গাটির কথা আমরা জানি সেখানে কিন্তু আমার মনে হয় সবচেয়ে ভাল হয় যদি কেউ কুইলন থেকে ব্যাক ওয়াটার নৌকোয় বা বোটে চড়ে ভ্রমণ করেন! অসাধারণ লাগবে এই পথটুকু যেতে। মোট ৮৪ কিলোমিটার দূরত্ব। সময় লাগবে প্রায় ১০ ঘন্টা। বিশেষ করে চাঁদনি রাতে ব্যাক ওয়াটারে বোটে ভেসে বেড়ানো এক অনন্য অভিজ্ঞতা। কেরলের ব্যাক ওয়াটারে ভ্রমণকে কেন পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকটি সুন্দর ভ্রমণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তা বোঝা যায় আলেপ্পি এলে। আলেপ্পি থেকে ব্যাক ওয়াটারে নৌকোয় ভেসে যাওয়া যায় কোট্টায়ম ও কোচিন শহরে। কেরল রাজ্যের ব্যাক ওয়াটার এবং পাহাড়ি জায়গাগুলির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যিই দেখার মতো। সারা কেরল রাজ্য ভ্রমণ করতে মোট ১২-১৩ দিন হলেই চলবে। মাঝারি হোটেলে থাকলে ১২-১৩ দিনে ৫০০০-৬০০০ টাকার মধ্যে পুরো বেড়ানোটাই শেষ হবে।

কী ভা বে যা বে ন

হাওড়া থেকে করমন্ডল এক্সপ্রেস (দুপুর ১টায় ছাড়ে) বা মাদ্রাজ মেল-এ (রাত্রি ৮টায় ছাড়ে) চেন্নাই স্টেশনে নেমে বাসে বা ট্রেনে সোজা ত্রিবান্দ্রম বা কোচিনে আসা যায়। অথবা হাওড়া থেকে কোচিন এক্সপ্রেস ধরে সরাসরি কোচিন চলে আসা যায়। দক্ষিণ ভারতের সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা কিন্তু ট্রেনের চেয়ে কোনও অংশে খারাপ নয়। বিমান যোগেও কোচিন যাওয়া যায়।

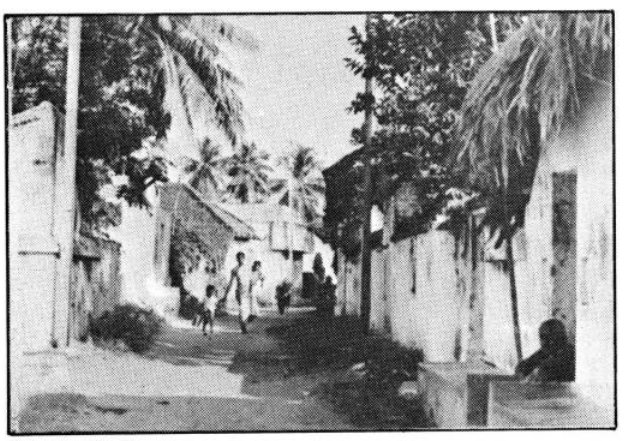

বিখ্যাত কুচিপুড়ি গ্রাম

কোভালমের সমুদ্রপারে দাঁড়িয়ে মানুষ প্রকৃতিকে আপন করে পেতে পারে।

ডেভিস কাপে ভারতের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডই ফেভারিট

ইংল্যান্ডের মাটিতে গ্রেগ রুসেদস্কি ও টিম হেনম্যানের মতো তারকাদের হারাতে পারবেন কি লিয়েন্ডার, মহেশ? আলোচনা করছেন **প্রতাপ জানা**

ভারতের সামনে এবার ডেভিস কাপের ওয়ার্ল্ড গ্রুপে টিকে থাকার লড়াই। এপ্রিলে ওয়ার্ল্ড গ্রুপের প্রথম রাউন্ডে ইতালির কাছে পরাজিত হওয়ার ফলে ডেভিস কাপের প্রথম ১৬টি দেশের মধ্যে স্থান ধরে রাখার জন্য ভারতকে এখন 'প্লে অফ টাই' খেলতে হবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। খেলা হবে নটিংহামে, ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর, সিন্থেটিক হার্ড কোর্টে। টাইয়ের ফলাফল কী হবে, বলা কঠিন। ইংল্যান্ডের ডেভিস কাপ দলের অক্রীড়ক অধিনায়ক। প্রথমে ভেবেছিলেন এই প্লে অফ টাই খেলবেন ঘাসের কোর্টে। কিন্তু পরে মত পালটে হার্ড কোর্টে খেলার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এর কারণ দুটি। প্রথমত, সেপ্টেম্বরে আবহাওয়া খারাপ থাকলে ঘাসের কোর্টে খেলা সমস্যা হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ইংল্যান্ডের টিম হেনম্যান ও গ্রেগ রুসেদস্কির মতো ভারতের লিয়েন্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতি ঘাসের কোর্টে খেলতেই বেশি পছন্দ করেন। ইংল্যান্ডের এই দু'জন শীর্ষস্থানীয় টেনিস তারকা টিম হেনম্যান ও গ্রেগ রুসেদস্কির হার্ড ও দ্রুতগতির কোর্টে দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে যথেষ্ট নামডাক আছে। এবার উইম্বলডনের সেমিফাইনালিস্ট ২৩ বছর বয়সী তারকা টিম হেনম্যান। আর ২৫ বছর বয়সী, বাঁ-হাতি খেলোয়াড় গ্রেগ রুসেদস্কি গতবছর রানার্সের সম্মান পেয়েছিলেন ইউ এস ওপেনে। নটিংহামের হার্ড কোর্ট অবশ্য খুব বেশি দ্রুত গতির নয়। অনেকটা ইউ এস ওপেনের হার্ড কোর্টগুলোর মতো। ইউরো-আফ্রিকান রেলিগেশন গ্রুপে ইংল্যান্ড ইউক্রেনকে হারিয়ে এবার ভারতের বিরুদ্ধে প্লে অফ টাই খেলার সুযোগ পেয়েছে। এর আগে ডেভিস কাপের আসরে ভারত ও ইংল্যান্ড মুখোমুখি হয়েছিল তিনবার—১৯৪৮, ১৯৫৫ ও ১৯৯২ সালে। প্রথম দু'বার ইংল্যান্ড জিতলেও শেষবারের সাক্ষাতে জিতেছিল ভারত, ৪-১ ম্যাচে।

গ্রেগ রুসেদস্কি

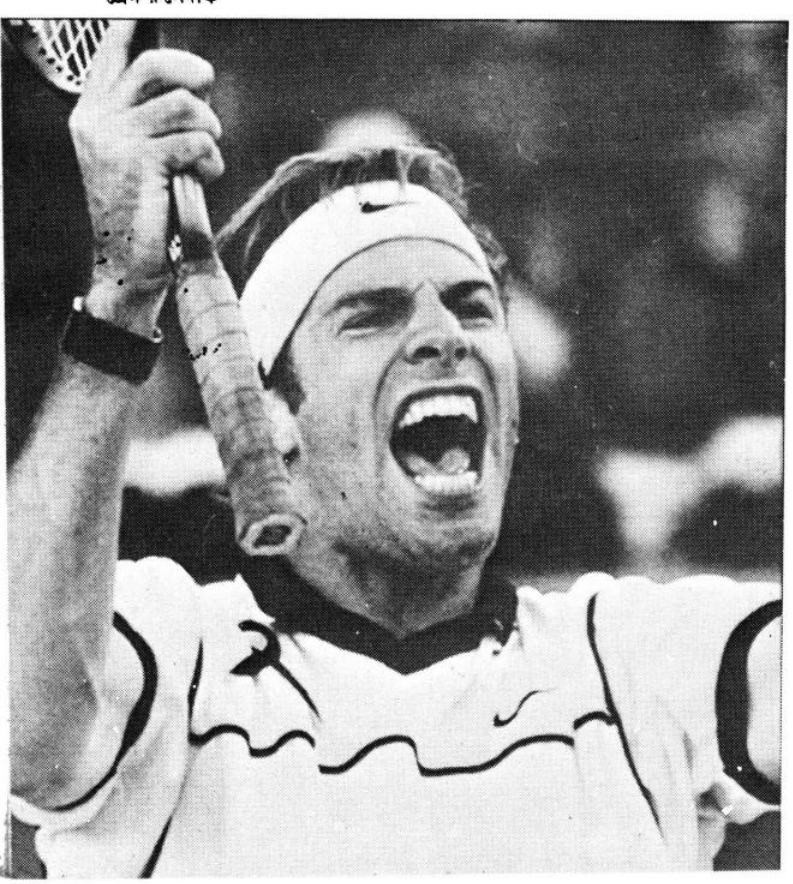

টিম হেনম্যান

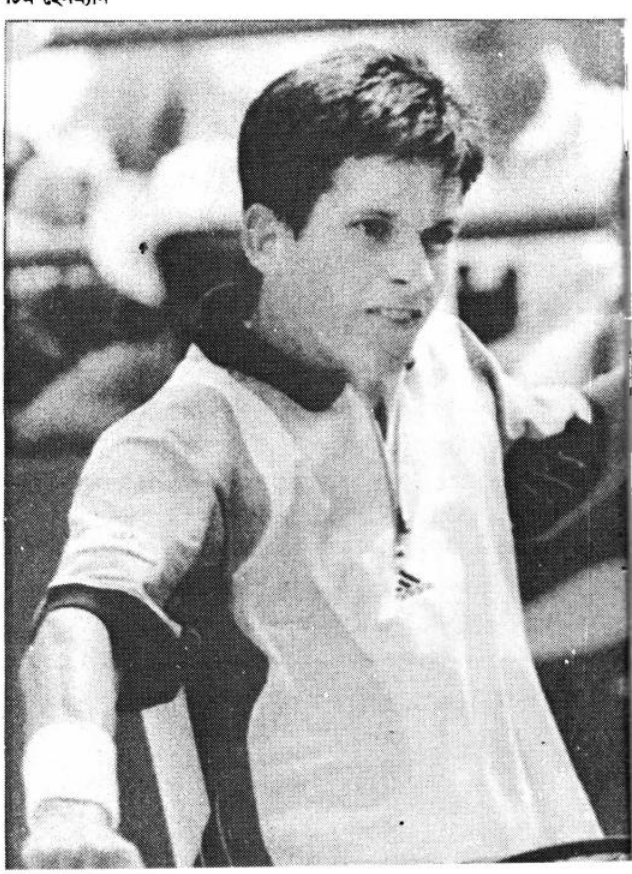

লিয়েন্ডার পেজ (বাঁ দিকে) ও মহেশ ভূপতি

দিল্লিতে ইংল্যান্ড সেই যে ব্যর্থ হয়, তারপর আর তারা ওয়ার্ল্ড গ্রুপে যেতে পারেনি। ওয়ার্ল্ড গ্রুপে ওঠার সুযোগ ইংরেজদের সামনে এসেছে পাঁচ বছর পর। বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে যথাক্রমে ছয় ও ১২ নম্বরে থাকা গ্রেগ রুসেদস্কি ও টিম হেনম্যানকে নিয়ে ইংল্যান্ডকে ডেভিস কাপ দল স্বভাবতই এখন ওয়ার্ল্ড গ্রুপে ওঠার জন্য যেমন মরিয়া, তেমনই উদগ্রীব প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যও। রুসেদস্কির কিন্তু জন্মসূত্রে ইংরেজ নন। তিনি জন্মেছিলেন কানাডায়। পরে বসবাস শুরু করেন ইংল্যান্ডে। কাগজ-কলমে শক্তির বিচারে ইংল্যান্ড যে ফেভারিট, তাতে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ওঠার পর থেকে ১৯৯৫ সাল ছাড়া প্রতি বছরই এলিট ১৬ গ্রুপে খেলেছে। এবার ভারতকে প্লে অফ টাই খেলতে হচ্ছে কিছুটা ঘটনাচক্রেই। ইতালির বিপক্ষে ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজ খেলতে পারলে হয়তো ফলাফল অন্যরকম হত। কাঁধে ব্যথার জন্য লিয়েন্ডার ইতালির বিপক্ষে ভারতের খেলতে পারেননি। ভারতীয় ডেভিস কাপ দলে লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতি, প্রহ্লাদ শ্রীনাথ ও সৈয়দ ফজলুদ্দিন— এই চারজন খেলোয়াড় থাকলেও অক্রীড়ক অধিনায়ক জয়দীপ মুখার্জির যা কিছু আশা-ভরসা, তা লি-মহেশকে ঘিরেই। ওলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী, ২৫ বছর বয়সী লিয়েন্ডার এই সেদিন জিতেছেন জীবনের প্রথম এ টি পি খেতাব। এর পর পাইলট পেন টেনিস টুর্নামেন্টে ভাল খেলার ফলে উঠে এসেছেন বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৭৩ নম্বরে। ২৪ বছর বয়সী, ভারতের দু'নম্বর সিঙ্গল্‌স খেলোয়াড় মহেশ ভূপতির ক্রমপর্যায় হচ্ছে ৩৪২। একথা ঠিক, ডেভিস কাপের লড়াইয়ে ক্রমপর্যায় বা র‍্যাঙ্কিং অনেক সময়ই কাজ করে না। এই বছরই তো জিম্বাবোয়ের কাছে হারতে হয়েছে শক্তিশালী দল অস্ট্রেলিয়াকে। আর এ-কথাও সকলের জানা, এ টি পি সার্কিটের লিয়েন্ডার এবং ডেভিস কাপের লিয়েন্ডারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য।

"দেশের হয়ে খেলার সময় ও একটা বাঘ।" লিয়েন্ডার সম্পর্কে বলেছেন প্রাক্তন ডেভিস কাপার রমেশ কৃষ্ণন। ডেভিস কাপের খেলায় লিয়েন্ডারের করছে হারতে হয়েছে জ্যাকব লাসেক, জেরমি বেটস, আর্নদ বশ, অরি ল্যাঁকত, গোরান ইভানেসেভিচ, ওয়েন ফেরিরা ও ইয়ান সিমেরিঙ্কের মতো ক্রমপর্যায়ে অনেক ওপরে থাকা তারকাদের। মহেশ ভূপতিও কম যান না। ডেভিস কাপের লড়াইয়ে তাঁর শিকারের তালিকায় আছেন জ্যাকো এলটিং, ইয়ান সিমেরিঙ্ক, গাব্রিয়েল সিলভারস্টেইন ও ডেভিড সানগুইনেট্টির মতো নামকরা খেলোয়াড়রা। বিশ্বের তিন নম্বর ডাবল্‌স জুটি লি-মহেশ। ডাবল্‌সের ম্যাচ ভারত জিতবে এটা ধরেই নেওয়া যায়। ডাবল্‌সের কথা বাদ দিলে সিঙ্গল্‌সে হেনম্যান-রুসেদস্কির হাত থেকে কমপক্ষে দুটি ম্যাচ লিয়েন্ডার কিংবা ভূপতি বের করে নেবেন, তাও আবার ওঁদের পছন্দের কোর্ট থেকে, এটা ভাবা একরকম কল্পনাবিলাসই। কিন্তু এখন লিয়েন্ডার যে ফর্মে আছেন তাতে ওঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা যেতেই পারে।

ডেভিস কাপে ভারত

প্রথম যোগদান	:	১৯২১ সালে।
প্রথম জয়	:	১৯২১ সালে প্যারিসে ফ্রান্সের বিপক্ষে ৪-১ ম্যাচে।
টাই খেলার সংখ্যা	:	১৪৮, জয় ৮৯টিতে এবং পরাজয় ৫৯টিতে।
সেরা সাফল্য	:	রানার্স তিনবার—১৯৬৬ (চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে), ১৯৭৪ ও ১৯৮৭ সালে।
ওয়ার্ল্ড গ্রুপে খেলেছে	:	মোট ১১ বছর।
সবচেয়ে বেশি টাই খেলেছেন :		রমানাথন কৃষ্ণন ও জয়দীপ মুখার্জি। ৪৩টি করে টাই।
সবচেয়ে বেশি সিঙ্গল্‌স ম্যাচ জিতেছেন	:	রমানাথন কৃষ্ণন। ৫০টি ম্যাচে জয় ও ১৯টি ম্যাচে হার।
সবচেয়ে বেশি ডাবল্‌স ম্যাচ জিতেছেন	:	প্রেমজিৎ লাল। ২৪টি ম্যাচে জয় ও ১২টি ম্যাচে হার।
সিঙ্গল্‌স ও ডাবল্‌স মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জিতেছেন	:	রমানাথ কৃষ্ণন—৬৯টি ম্যাচে জয় ও ২৮টি ম্যাচে হার।
সেরা ডাবল্‌স জুটি	:	বিজয় ও আনন্দ অমৃতরাজ, ১৭টি ম্যাচে জয় ও ৯টি ম্যাচে হার।
ফাইনালে খেলেছেন	:	রমানাথন কৃষ্ণন, জয়দীপ মুখার্জি, বিজয় অমৃতরাজ, আনন্দ অমৃতরাজ ও রমেশ কৃষ্ণন।
লিয়েন্ডার পেজের রেকর্ড :		টাই খেলেছেন—২০টি। সিঙ্গল্‌সে জয় ২৩টি ম্যাচে এবং হার ১৪টি ম্যাচে। ডাবল্‌সে জয় ১৩টি ম্যাচে এবং হার সাতটিতে। আবির্ভাব—১৯৯০ সালে, জাপানের বিপক্ষে।
মহেশ ভূপতির রেকর্ড	:	টাই খেলেছেন—আটটি। সিঙ্গল্‌সে জয় সাতটি ম্যাচে এবং হার ন'টি ম্যাচে। ডাবল্‌সে জয় তিনটি ম্যাচে এবং হারও তিনটি ম্যাচে। আবির্ভাব ১৯৯৫ সালে। হংকং-এর বিপক্ষে।

(৬০ পাতার পর)

একটাও পড়া পারি না। এটা কী করে হয়? বাড়িতে এবং ইস্কুলে কথাটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় আমাকে বিস্তর নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল। সেকেন্ড হওয়ার কী জ্বালা!

মজার ঘটনা যদি বলো তা হলে মজার। কিন্তু সেটা আর একজনের পক্ষে মজার হয়নি। তখন আমরা কাটিহারে। আমার একটি বোকাসোকা বন্ধু ছিল। তাকে যা বলতাম সে তাই করত। আমি তখন এক পকেটে গুলতি, আর এক পকেটে পাথরের টুকরো নিয়ে ঘুরে বেড়াই। আর 'টার্গেট প্র্যাকটিস' করি। একদিন কী দুর্বুদ্ধি হল, সেই বন্ধুকে বাড়ির বারান্দার এক প্রান্তে দাঁড় করিয়ে, অন্য প্রান্ত থেকে সোজা তার বুক লক্ষ্য করে বেশ বড়সড় একটি পাথর গুলতিতে ভরে চালিয়ে দিয়েছিলাম। ছেলেটা বোকা ছিল বলেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, অন্য কেউ হলে পালাত। সেই 'গুড়ুল' ছুটে গিয়ে তার বুকে লাগার সঙ্গে সঙ্গে সে 'আঁক' করে একটা শব্দ তুলেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ঘটনা যে এরকম হবে তার আন্দাজ আমার ছিল না। কাণ্ড দেখে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই। তারপর আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে একটা সাপখোপে ভরা জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপের মতো জায়গায় লুকিয়ে রইলাম। সন্ধের পর অবশ্য আমাদের মিশিরজি ঠাকুর এসে সাধাসাধি করে বাড়ি নিয়ে গেল। এই মিশিরজি আমাকে খুব ভালবাসত। আমার বাবা রেলে চাকরি করতেন বলে বদলির সূত্রে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। আমরা যখন দোমোহনিতে থাকি তখন শওকত আলির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এইরকম গুণী মানুষ আমি কমই দেখেছি। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, ম্যাজিক দেখানো, শারীরবিদ্যায় ওরকম পটু মানুষ আমি আর দেখিনি। এই শওকত আলির সঙ্গে আমরা অনেক কচিকাঁচা জুটে গিয়েছিলাম। এই শওকত আলি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন। শুধু একটি জিনিস চেষ্টা করেও শেখাতে পারেননি— সেটা হল কী করে ভূতের ভয় কাটানো যায়। একটা ভারী মজা হয়েছিল। দোমোহনিতে একবার এক 'ম্যাজিশিয়ান' এসেছিলেন। তিনি মঞ্চে নানারকম ম্যাজিক দেখিয়ে আমাদের তাক লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর হাবভাবের মধ্যে দোমোহনির প্রতি একটু তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেয়েছিল। এর ফলে হল কী, ওই

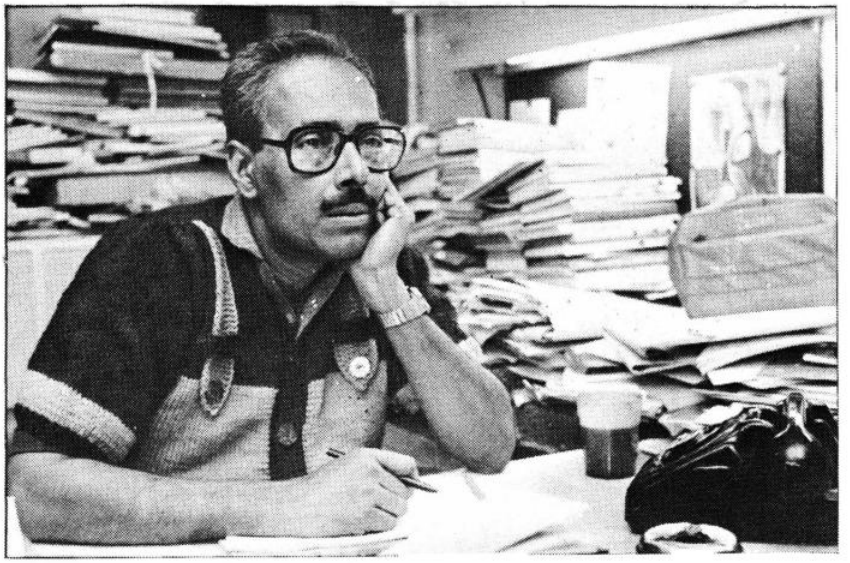

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ফোটো : প্রিয়রঞ্জন রক্ষিত

ম্যাজিশিয়ানকে দর্শকের আসনে বসিয়ে ওই একই মঞ্চে শওকত আলি সেই ম্যাজিকগুলো তো দেখালেনই, এ ছাড়া আরও নতুন নতুন ম্যাজিক দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ করে দিলেন। শওকত আলির ম্যাজিক দেখে সেই ম্যাজিশিয়ানও হাততালি দিয়েছিলেন।

দোমোহনিতে এক দুপুরবেলা খবর পাওয়া গেল, স্টেশনের আউটার সিগনালের কাছে একটা গাঁয়ে গত রাতে চারটে বাঘ বসে থানা গেড়েছে। তারা গোয়ালঘরে ঢুকে গোরুবাছুর মারছে। সুতরাং বাঘ মারার জন্য সেখানে শিকারিদের যাওয়া দরকার। এ খবর পেয়েই শিকারিদের পিছু পিছু আমরাও ছুটলাম। শিকারি বলতে অবশ্য পেশাদার শিকারি নয়। রেলের একজন সাহেব, একজন পঞ্জাবি কন্ট্রাক্টর, একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী আর শওকত আলি। শওকত আলির অবশ্য বন্দুক নেই, লাঠি ছাড়া তাঁর আর কোনও অস্ত্র ছিল না। আউটার সিগনালের একটা জঙ্গলের কাছে ক্যানেস্তারা বাজিয়ে বাঘ বের করে আনার চেষ্টা চলছিল। অনেকক্ষণের চেষ্টায় তাড়া খেয়ে বাঘ কিন্তু সত্যিই বেরোল। উত্তরবঙ্গে তখন চিতাবাঘেরই উৎপাত বেশি ছিল। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে সেই চিতাবাঘের দৌড় দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। কোনও প্রাণী যে অত জোরে দৌড়তে পারে তার কোনও ধারণাই আমার ছিল না। তিন-তিনটে বন্দুক গর্জন করে উঠল, কিন্তু ছ'টা গুলির একটিও বাঘকে স্পর্শ করতে পারল না। সেই দ্রুতগামী বাঘ বন্দুকের নাগাল এড়িয়ে ধানখেতে ঢুকে গেল। তারপর বহুদূর পর্যন্ত সে ধানখেতে হিলিবিলি তুলে কোথায় মিলিয়ে গেল, কে জানে! বাঘটাকে মারা গেল না বলে এত আনন্দ পেয়েছিলাম যে বলার নয়। চারটে বাঘের মধ্যে একটা সন্ধের মুখে মারা পড়েছিল। তাকে যখন বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে আসা হল তখন বড্ড কষ্ট হয়েছিল। অত সুন্দর প্রাণীকে কি মেরে ফেলা উচিত?

আমাদের বাড়িতে দুটো অল্পবয়সী ছেলে থাকত। কাজকর্ম করত। তাদের মধ্যে একজন ছিল রাখাল। সে প্রত্যেকদিন নিশুত রাতে ভূত দেখে চেঁচামেচি করত, সে কখনও একটা ভূত দেখত না, দুটো তিনটে ভূত দেখত। আর ভূত দেখে সে বেজায় কান্নাকাটি করত। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। দলে দলে সাহেব আর নিগ্রো সৈন্যরা ট্রেনে চেপে কোথায় যেন যায়। তারা মাঝে মাঝে আমাদের দেখে বিস্কুটের প্যাকেট ছুড়ে দিয়ে যেত। সেই প্যাকেট খুলে আমরা বিস্কুট খেয়ে দেখেছি, এত বাজে স্বাদ আর হয় না। কে জানে, ওগুলো বোধ হয় কুকুরদের জন্য তৈরি হত! আমরাও শেষপর্যন্ত ওগুলো পোষা কুকুরগুলোকে খাওয়াতাম।

মাল জংশনে আমরা থাকতাম একটা কাঠের বাংলো বাড়িতে। মোটা-মোটা কাঠের খুঁটির ওপর তৈরি সেই বাড়িটা ছিল অনেকটা জাহাজের মতো। পেছনেই চা-বাগান। সন্ধের পর বাঘ বেরোত এবং ফেউ-এর ডাক শোনা যেত। বাবা বেশিরভাগ সময় লাইনে যেতেন। বাড়িতে থাকতাম মা, আমি, দিদি আর আমার একেবারে শিশু একটি বোন। সন্ধের পর এত

ভয় লাগত যে, বলার নয়। সেই সময় সন্ধেবেলায় কিছু আমেরিকান সৈন্য সম্ভবত নকল যুদ্ধ খেলতে খেলতে আমাদের বাড়ির তলায় চলে আসে। তলাটা ফাঁকা ছিল বলে তাদের খেলার খুব সুবিধে হয়েছিল। বাড়ির নীচে ধুপধাপ পায়ের শব্দ শুনে মা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। সন্ধেবেলায় আমাকে আর দিদিকে পড়াচ্ছিলেন একজন বাচ্চা মাস্টারমশাই। সেই মাস্টারমশাই টর্চ হাতে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দরজা খুলে বেরিয়ে "কে, কে" বলে কাঁপা গলায় চিৎকার করতে লাগলেন, তখন সেই আমেরিকানরা ইংরেজিতে শিউমিউ করে কী বলল আমরা একবর্ণ বুঝতে পারলাম না। তবে হাবেভাবে বোঝা গেল, আমরা ভয় পেয়েছি দেখে তারা একটু লজ্জিত। ক্ষমাটমা চেয়ে চলে গেল। সেই বাড়িতেই আমি আমার জীবনের প্রথম ও শেষ গুপ্তধন পেয়ে যাই। একদিন দুপুরবেলা খেলা করতে করতে উঁচু উঁচু কাঠের খুঁটিগুলোর ওপরে গুপ্ত খাঁজে হাত ঢুকিয়ে আমি প্রথমে একটি পেতলের উট পেলাম। তারপর অন্যান্য খুঁটির খাঁজ থেকে নানা জিনিস বেরোতে লাগল। কোনওটাই দামি জিনিস নয়। কিন্তু সবই অযাচিত প্রাপ্তি বলে ভারী মজা পেয়েছিলাম। কে যে জিনিসগুলো লুকিয়ে রেখেছিল কে জানে! সেইসব জিনিসের কিছু কিছু এখনও আমাদের শিলিগুড়ির বাড়িতে আছে।

এই ভয়ের কথাও আমি অনেকবার লিখেছি। তখন আমরা কাটিহারে। প্রচণ্ড এক শীতের রাতে ঠাকুমা আর দিদির মাঝখানে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি। নিশুত রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। আর ঘুম ভেঙেই আমার মনে হল এখনএকটা কিছু ঘটবে। আর সেটা ঘটবে শুধু আমার জন্যই। কেন এটা মনে হয়েছিল তা আজ বলতে পারব না। কাটিহারে আমাদের রেলের বাংলো বাড়িটা ছিল খুব নির্জন আর চারদিকে বিশাল পাঁচিল। পেছনের গেটটা বড় একটা ব্যবহার হত না। সেইদিকে ভাঁট গাছের জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল। আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম, পেছনের সেই ফটকের কাছ থেকে একজোড়া 'হাই হিল' জুতোর আওয়াজ টকটক করে আমাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। হাই হিলের শব্দটা খুব চেনা ছিল। কারণ তখন ব্রিটিশ আমলে হাই হিল পরা মেমসাহেবদের ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। শব্দটা তাই ভুল হওয়ার নয়। সেই জুতোর আওয়াজ সোজা আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের বন্ধ দরজা ভেদ করে পাশের 'ডাইনিং হল'-এ ঢুকল। সেই ঘরে একটা ডাইনিং টেব্‌ল ছিল। তার চারপাশে কয়েকবার ঘুরে পায়ের শব্দটা ফের যেমন এসেছিল, তেমনই আবার ফিরে চলে গেল। আমার চেঁচামেচি শুনে ঠাকুমার ঘুম ভাঙল, কিন্তু আমার কথাটাকে পাত্তা দিলেন না। মুশকিল হল, এই ঘটনাটা একদিনের নয়। বারবার সাতদিন, আটদিন, ১০ দিনের মাথায় ঘটতে থাকল। আরও বিস্ময়ের কথা, আমরা কাটিহার ছেড়ে নানা জায়গায় চলে যাই। কিন্তু ওই শব্দ আমার পিছু ছাড়েনি। আমার পাঁচ বছর বয়সে এই শব্দ শোনা শুরু হয়েছিল। ১৩/১৪ বছর বয়স অবধি এই শব্দ আমার সঙ্গী ছিল। কিছুদিন পরপর নিশুত রাতে ঘুম ভেঙে এই শব্দ আমাকে শুনতে হয়েছে। পরে অবশ্য আর ভয় পেতাম না।

ওই শব্দ যেন আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। আজও এই ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি।

স্মরণীয় অভিজ্ঞতা

বেলজিয়ামের প্রথম অনুষ্ঠানের স্মৃতি কখনও ভুলব না

অমলাশঙ্কর

এখনও আমার মনে পড়ে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসের সেই সন্ধ্যার কথা। প্রায় ৬৭ বছরের পুরনো স্মৃতি আজও ভুলতে পারিনি। বেলজিয়ামের লিয়েজ শহরে অপেরা থিয়েটারে ওইদিন ছিল আমার জীবনের প্রথম প্রকাশ্য নাচের অনুষ্ঠান। আমার তখন বয়স কত? ১২ বছরও হয়নি।

ওইটুকু একটা মেয়ে সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে হঠাৎ বেলজিয়ামে কী করে পৌঁছল, এই প্রশ্ন আসতেই পারে কারও-কারও মনে। আমার বাবা অক্ষয় নন্দী ছিলেন নামী অলঙ্কারশিল্পী। গ্রামের মেয়েদের বলতেন বিদেশি কাচের চুড়ি ভেঙে ফেলতে। বলতেন, দেশ স্বাধীন হোক, ভাল চুড়ি করে দেব নিজের হাতে। আমাকে খুব ভালবাসতেন বাবা। ১৯৩০ সালে প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তিনি ডাক পেলেন। আমিও গেলাম সেখানে। আর প্যারিসেই পরিচয় হল মনুভাই শঙ্কর, তাঁর পরিবারের সকলের সঙ্গে। আমিও হয়ে গেলাম ওঁদের পরিবারের একজন। রবিশঙ্করের চেয়ে আমি বয়সে সামান্য বড় ছিলাম। খেলা করতাম দু'জনে। মনুভাই শঙ্করের স্ত্রী অর্থাৎ উদয়শঙ্করের মা হেমাঙ্গিনী তো আমাকে চোখের আড়াল হতে দিতেন না। বাবা চলে এলেন দেশে। ওঁরা প্রায় জোর করেই আমাকে রেখে দিলেন। আমার মাকে চিঠিতে জানালেন, অমলা থাকবে আমাদেরই মেয়ের মতো। ওই শঙ্কর পরিবারই আমাকে শিখিয়ে নিল নাচ-গান। উদয়শঙ্করের খ্যাতি তখনই প্রায় জগৎজোড়া। উনি নিজের হাত ধরে শেখালেন কালীয়দমন নাচ।

কয়েক মাসের মধ্যে বেলজিয়ামের সেই অনুষ্ঠান। অত সাহেব-মেমসাহেব দেখে আমি তো প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। স্টেজে ছিলেন রবিশঙ্কর, সিমকি, কনকলতা ও আরও অনেকে। উদয় আমার জন্য তার আর জরি দিয়ে বানিয়েছিলেন কালীয়র পাঁচটি ফণার 'ফ্রেম'। পিঠে লাগিয়ে দিলেন সেটি। কালীয়র তো পাঁচটি ফণাই ছিল। আমি কালীয়, উনি কৃষ্ণ। অনুষ্ঠান-শেষে পরদা পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বজ্রপাতের মতো ক্রমাগত হাততালি। অভাবনীয় হর্ষধ্বনি। ভয়ে আমি ছুটে স্টেজ থেকে পালিয়ে গেলাম। অপেরার ম্যানেজার গিয়ে আমাকে পাঁজাকোলা করে

নিয়ে এলেন স্টেজে, সকলের মধ্যে। এর পর জার্মানিতেই ৭৫ টা অনুষ্ঠান করেছি। ইউরোপের প্রতিটি শহরের বিখ্যাত অপেরায় নৃত্য পরিবেশনের দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি। ইতালির মিলানে এস্কালা অপেরায় অনুষ্ঠান করতে গিয়ে ভেবেছি, ভারতের আর কে-ই বা এইরকম নামজাদা অপেরায় নৃত্য পরিবেশনের সুযোগ পায়।

জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিনের কথা বলতে গেলে মনে পড়ে ১৯৩৯-এর ৮ ডিসেম্বরের কথা। উদয়ের জন্মদিন ওই তারিখে। পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে ওঁকে আমি আমার গুরু বলেই জানতাম। ওঁকে ভালবাসতাম ঠিকই, তবে মনকে এটাও বলতাম, বামন হয়ে চাঁদ ধরতে নেই। কোনও সময় প্রকাশ করিনি ওঁকে বিয়ে করার ইচ্ছে। কিন্তু জন্মদিনে উদয় এসে বললেন, আমাকে উনি বিয়ে করতে চান। মাথা নিচু করে বসে ছিলাম আমি। উনি চলে গেলে দু'ঘণ্টা কেঁদেছি। স্বপ্ন কি সত্যিই তা হলে সফল হয়? বিয়ে হল '৪২-এর ৮ মার্চ। হিমালয়ের কোলে আলমোড়ায়। সকালে হল রেজিস্ট্রি, বিকেলে বৈদিক অনুষ্ঠান। কয়েকদিন আগে রেডিওয় সতী দেবীর রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। কলকাতা থেকে তাঁকে নিয়ে গেলাম আলমোড়ায়। সঙ্গে তাঁর দিদি গৌরী আর ছোট্ট মেয়ে রুমা, এখন যিনি ব্যবহার করেন গুহঠাকুরতা উপাধি। রেডিওর সেই গানটাই গাইলেন সতী দেবী—"তোমার আমার মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা।" এর পর থেকে আমার প্রতি বিবাহবার্ষিকীতে আমি বা অন্য কেউ গেয়েছি ওই গান। সতী দেবীকে তিন বছর রেখে দিয়েছিলাম আলমোড়ায় উদয়শঙ্কর কালচারাল ইনস্টিটিউটে। রুমাও নাচ শিখল ওখানে। আমাদের নবজীবনের শুভকামনা করে নামীদামি অনেকেই চিঠি দিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখলেন, "বিংশ শতাব্দীর হর-পার্বতীর বিয়ে।" সত্যিই আমরা সুখী হয়েছিলাম। বিয়ের সময় আমি ছিলাম ২২ বছরের, উনি ৪১। কোনওদিন বয়সের এই ব্যবধান আমাদের সম্পর্ককে ভারী করে তোলেনি। তৈরি করেনি ভুল বোঝাবুঝির বাতাবরণ।

প্রচণ্ড দুঃখ বা অবাক হওয়ার একটা ঘটনাও বলি। আমার ছেলে আনন্দের বিয়ে হল '৭৪-এ। আমাদের গল্‌ফ ক্লাব রোডের বাড়িতে। বিয়ের পর ও আর তনুশ্রী থাকত কাছেই

অমলাশঙ্কর

হিন্দুস্থান পার্কে। একদিন রাতে ওরা আমার বাড়ি থেকে খেয়ে গাড়ি চড়ে বেরিয়ে গেল। অনেক রাত। বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরল আমার ভাইঝি নন্দিতা। এস. এস. কে. এম. হাসপাতালের এক নার্স ফোনে জানালেন, ফেরার পথে আনন্দের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। ওঁদের অবস্থা এখন-তখন। নন্দিতাকে নিয়ে আমার নতুন কেনা অ্যাম্বাসাডরে করে ছুটে গেলাম হাসপাতালে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো এমার্জেন্সিতে খুঁজলাম আনন্দ-তনুশ্রীকে। ডাক্তাররা জানালেন, এরকম কোনও আহতকে নিয়ে আসা হয়নি। মায়ের মন তো। মানল না ওঁদের কথা। অন্য দু'-একটা ওয়ার্ড দেখলাম। না পেয়ে গেলাম শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। সেখানেও না পেয়ে গেলাম রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে। রাত তখন গভীর। নির্জন রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটছে ঝড়ের মতো। আমি এবার গেলাম আনন্দর বাড়িতে। গাড়ির হর্ন শুনে ও নেমে এল ওপর থেকে। কোলাপসিবল গেট খোলার আগেই আমার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে প্রশ্ন করল, "কী হয়েছে মা?" গেট খোলার আগেই ওকে সুস্থ দেখে আমি পড়ে গেলাম মাটিতে। যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম সবার মুখেই চিন্তার ছাপ। আজও আমি জানতে পারিনি, এইরকম নিষ্ঠুর রসিকতা কে করতে পারে? এর যুক্তিটাই বা কী?

স্মরণীয় সাক্ষাৎকার

টিউব রেলের গোলমালে করশনয়ের সঙ্গে খেলার সুযোগই হাতছাড়া হতে বসেছিল

দিব্যেন্দু বড়ুয়া

আর একটু হলে আমার করশনয়ের সঙ্গে খেলার সুযোগই ফস্কে যেত। প্রথমে লন্ডনের টিউব রেলের সম্পর্কে জানা না থাকায় ঠিকঠাক স্টেশনে নামতেই পারছিলাম না, তারপরে আবার খেলার জায়গায় পৌঁছে দেখি ঢোকার দরজাই বন্ধ। সব মিলিয়ে সে এক বিশ্রী অবস্থা।

সেটা ১৯৮২ সাল। জীবনে দ্বিতীয়বার লন্ডনে খেলতে গিয়েছি। লয়েড্‌স ব্যাঙ্কের ওই টুর্নামেন্টে ভিক্টর করশনয়কে হারিয়েই আমি প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেলাম। তিনি তখন বিশ্বের দু'নম্বর খেলোয়াড়, কিছুদিন আগেই কারপোভের কাছে হেরে গিয়েছেন। দাবা জগতে তাঁর বিশাল নামডাক। তাঁর বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পাওয়াই ভাগ্যের

ব্যাপার, জেতা তো স্বপ্নের অভিজ্ঞতা। কিন্তু সামান্য ভুলের জন্য সেই খেলার সুযোগই আমি খোয়াতে বসেছিলাম।

আসলে দিনটা ছিল রবিবার। সেবারে আমরা গিয়ে উঠেছিলাম পূর্ব লন্ডনের একটা বাড়িতে। সেখান থেকে রোজ টিউব রেলে করে আসতাম বার্বিকান সেন্টারে খেলতে। আমি আর বাবা প্রতিদিনের মতো সেই দিনও ট্রেনে করে বার্বিকান সেন্টারে যাব ঠিক করেছিলাম। সেই অনুযায়ী বাড়ি থেকে বেরিয়ে মেট্রো স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠেছি। কিন্তু আমাদের জানা ছিল না, রবিবার ছুটির দিন সব স্টেশনে ট্রেন থামে না। বার্বিকান সেন্টারের স্টেশনে তো থামেই না।

লয়েড্‌স ব্যাঙ্কের টুর্নামেন্টে তার আগের বারও, ১৯৮১ সালে আমি খেলতে গিয়েছি, জীবনের প্রথম ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার নর্মও পেয়েছি। কিন্তু লন্ডন তখনও আমার কাছে একেবারে অজানা জগৎ। এখন অনেকবার যাওয়ার সুবাদে অনেক কিছু চিনি-জানি, তখন কিচ্ছুটি জানতাম না। বাবার অবস্থাও আমার মতোই। লয়েড্‌স ব্যাঙ্কে খেলার দিনই গিয়ে জানতে পারা যেত, আজ কার সঙ্গে কিস্তিমাতের লড়াই। সেই রবিবার যে আমার সঙ্গে করশনয়ের খেলা পড়েছে, তা আমার জানাও ছিল না। চুপচাপ ট্রেনে চেপে রওনা দিয়েছি বার্বিকান স্টেশনের দিকে। শুধু জানি, দুপুর একটা থেকে খেলা। কিন্তু স্টেশন আসার পর দেখলাম সেখানে ট্রেন থামল না। আমরা তো রীতিমত অবাক। যাই হোক পরের যে স্টেশনে ট্রেন থামল, সেখানেই আমরা নেমে পড়লাম।

তখনও বুঝতে পারিনি গণ্ডগোল কোথায় হচ্ছে, তাই ফের উলটোদিকের আর একটা মেট্রোয় চড়লাম বার্বিকান সেন্টারে যাওয়ার জন্য। সেই ট্রেনটাও থামল না দেখে আমরা পড়ে গেলাম মহা ফাঁপরে। শেষ পর্যন্ত ট্রেনেরই একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম আসল ব্যাপারটা। ততক্ষণে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। সেই ভদ্রলোকই আমাদের বুদ্ধি দিলেন, কাছের একটা স্টেশনে নেমে বাকি পথটা হেঁটে যেতে। সেইমতো কাছাকাছি একটা স্টেশনে নেমে আমি আর বাবা জোরে হাঁটা লাগালাম বার্বিকান সেন্টারের দিকে। সেখানে পৌঁছে দেখি আর একটা গেরো। যে গেট দিয়ে ঢুকে আমরা লিফ্‌টে করে ওপরে যাই, সেই দরজাটাও রবিবার বলে বন্ধ। কোথা দিয়ে ভেতরে ঢুকব

দিব্যেন্দু বড়ুয়া

তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। শুধু বাড়িটার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর লোক খুঁজছি কাকে জিজ্ঞেস করে জানা যায় ঢোকার উপায়! অনেকক্ষণ পরে একজন বাড়ি থেকে বেরনো মাত্র তাঁকেই আমরা পাকড়াও করলাম ওপরের তলায় যাওয়ার সুলুক-সন্ধান জানার জন্য। তাঁর কাছ থেকেই পেছনের গেটের হদিস পেয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা লয়েড্‌স ব্যাঙ্কের টুর্নামেন্ট যেখানে চলছে, সেইখানে পৌঁছতে পারলাম।

খেলার জায়গায় যখন আমি ঢুকলাম, ততক্ষণে ঘড়ির কাঁটায় ১টা বেজে ১০ মিনিট। পাক্কা ১০ মিনিট কেটে গিয়েছে, দেখি বোর্ডে লেখা আমার সঙ্গে করশনয়ের খেলা। একে দেরি হয়ে গিয়েছে, তার ওপরে ভিক্টর করশনয়ের সঙ্গে দাবার বোর্ডে মুখোমুখি হওয়া। নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না, এরকম একটা পরিস্থিতিতে ১৬ বছর বয়সী একজন দাবাড়ুর কতটা টেনশন হতে পারে। সেটা আরও বাড়িয়ে দিল বোর্ডে বসা মাত্র চারপাশ থেকে ফোটোগ্রাফারদের ফ্ল্যাশবাল্বের ঝলকানি। এখনও মনে আছে আমার ছিল সাদা ঘুঁটি, আর করশনয়ের কালো। খেলার শুরুতে আমি ভাবছিলাম কী করে ড্র রাখা যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম, আমিই শেষ হাসিটা হাসতে পারি। বেশ কিছুক্ষণ লড়াই চালানোর পরে ৫৫ চালের মাথায় আমিই জিতলাম।

খেলা শেষ হওয়ার পর দেখি অদ্ভুত ব্যাপার। সবাই আমাকে ঘিরে হাততালি দিচ্ছে। ব্রিটিশদের কাছে এই ধরনের আচরণ একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তার ওপরে আবার দাবা প্রতিযোগিতায় হাততালি দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেই না। কিন্তু করশনয় একেবারে অপরিচিত একটি ছেলের কাছে হেরে গিয়েছেন শুনে সবাই অন্য টেবিল থেকেও চলে এসেছেন আমায় দেখতে। বিশাল হইহুল্লোড় শুরু হয়ে গেল আমাকে নিয়ে। যে খেলার সুযোগটাই আর একটু হলে ফস্কে যাচ্ছিল, সেই খেলায় জিতে রাতারাতি আমার নাম ছড়িয়ে পড়ল। পরের দিন কাগজে-কাগজে আমার ছবি, আমার জেতার খবর। বলতে গেলে ওই একটা খেলাই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। আমায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিল। সেই বারই লয়েড্‌স ব্যাঙ্ক টুর্নামেন্ট থেকে জীবনের দ্বিতীয় ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার নর্ম পেয়ে ইন্টারন্যাশনাল মাস্টারও হলাম।

কিন্তু এই সবকিছুই হাতছাড়া হয়ে যেত টিউব রেলে ভুলের জন্য। আজও আমার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় দিন ওই করশনয়কে হারানোর দিনটাই। পরে গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছি। দাবা ওলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদকও পেয়েছি ভারতের হয়ে খেলতে গিয়ে, কিন্তু বার্বিকান সেন্টারের সেই দিনটা এখনও মনে রয়েছে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ সরকার, অশোক সেনগুপ্ত, সব্যসাচী সরকার, সুমন ভট্টাচার্য ও মণিশঙ্কর দেবনাথ

কুইজ

প্রশ্ন

(১) সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন বাংলা সিনেমার এক জনপ্রিয় অভিনেতা। কে তিনি?
অমিতাভ মজুমদার, পাইকপাড়া, কলকাতা।

(২) কমনওয়েল্থ গেম্স ও সহারা কাপের জন্য তৈরি হয়েছে দুটি ক্রিকেট দল। এর মধ্যে একটি দলের সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কোন দলটির?
সার্বর্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্ব দিগন্ত, কলকাতা।

(৩) সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'দ্য ফ্র্যাগ্রান্স অব গোয়াভা' নামে একটি বই। এক বিখ্যাত সাহিত্যিককে নিয়ে লেখা হয়েছে বইটি। কে এই সাহিত্যিক?
ইমন সেন, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা।

(৪) এ-বছর ফেডারেশন কাপে চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স হয়েছে যথাক্রমে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। তৃতীয় স্থান পেয়েছে কোন ক্লাব?
পিন্টু অধিকারী, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

(৫) সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও

এই ক্রিকেটারের নাম কী

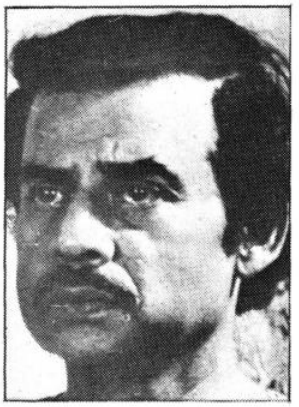

কে এই অভিনেতা

ক্রিকেটের জন্য অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের আর এক সদস্য। কে তিনি?
সৌগত হাজরা, হৃদয়পুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

(৬) ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সম্প্রতি ফিরেছেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। কী উপলক্ষে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি?
জয়দীপ বড়ুয়া, বৈদ্যবাটী, হুগলি।

(৭) ভারত ও পাকিস্তান পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানোর পরে ইদানীং সি টি বি টি চুক্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচুর আলোচনা চলছে। এই চুক্তিটির বিষয় কী?
ঊর্মিলা বসু রহমান, পার্কসার্কাস, কলকাতা।

(৮) ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম পার্লামেন্ট। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় আইনসভাকে ডাকা হয় কী নামে?
সম্রাট চক্রবর্তী, শিবপুর, হাওড়া।

(৯) বেলুড় মঠের মহাধ্যক্ষ স্বামী

ইউ এস ওপেনে হেরেছেন ইনি

ভূতেশানন্দজি মহারাজের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর জায়গায় এসেছেন কে?
ইন্দ্রজিৎ গোস্বামী, কাটোয়া, বর্ধমান।

(১০) ইউ.এস. ওপেনে মেয়েদের সিঙ্গল্স প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিন্ড্সে ড্যাভেনপোর্ট। ফাইনালে কাকে হারিয়েছেন তিনি?
শিপ্রা প্রামাণিক, বোসপুকুর, কলকাতা।

(১১) ডেভিস কাপে এবার ভারতের মুখোমুখি ইংল্যান্ড। সিঙ্গল্সে ইংল্যান্ডের কোন দুই খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে?
প্রিয়তোষ কানুনগো, শকুন্তলা পার্ক, কলকাতা।

(১২) সম্প্রতি ভেজাল সর্ষের তেল খেয়ে বহু মানুষ অসুস্থ হয়েছেন দিল্লিতে। ভেজাল তেল থেকে যে অসুখটি হয়েছে সেটি কী?
অনির্বাণ পাল, কুঁদঘাট, কলকাতা।

(১৩) ভিক্টর চের্নোমির্দিনের পর রাশিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন কে?
বিনায়ক বসু, শ্রীরামপুর, হুগলি।

(১৪) সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন জাপানের বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক আকিরা কুরোশাওয়া। হিরোশিমায় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পটভূমিতে তিনি যে চলচ্চিত্রটি তৈরি করেছিলেন, সেটির নাম কী?
অর্চন চট্টোপাধ্যায়, পাল্লা রোড, বর্ধমান।

(১৫) বহু বছর পর জন ট্রাভোল্টার একটি ছবি আসছে কলকাতায়। ছবিটির নাম কী?
শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডোমজুড়, হাওড়া।

(১৬) মহম্মদ আলি পার্কের তলায় ভূগর্ভস্থ জলাধারের পর কলকাতা শহরে সম্প্রতি খোঁজ মিলেছে আর একটি ঐতিহাসিক নির্মাণকার্যের। কী সেটি?
পার্থ চক্রবর্তী, তারাতলা, কলকাতা।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) মার্ক রসে, সের্গেই ব্রুগুয়েরা ও পিট সাম্প্রাস।
হেরেছেন গোরান ইভানেসেভিচ-এর কাছে।
(২) শেন ওয়ার্ন।
(৩) নানা ধরনের বাসনপত্র।
(৪) 'পার'।
(৫) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।
(৬) জঙ্গলে যাঁরা পাখির খোঁজ করে বেড়ান।
(৭) শ্রীলঙ্কা।
(৮) মীরা নায়ার।

মীরা নায়ার

(৯) আমেদাবাদ।
(১০) ১৭৮৪ সালে।
(১১) সর্দার বল্লভভাই পটেল।
(১২) ড: এম. এস. স্বামীনাথন।
(১৩) শিশুনাগ বংশ। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে।
(১৪) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।
(১৫) গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ।

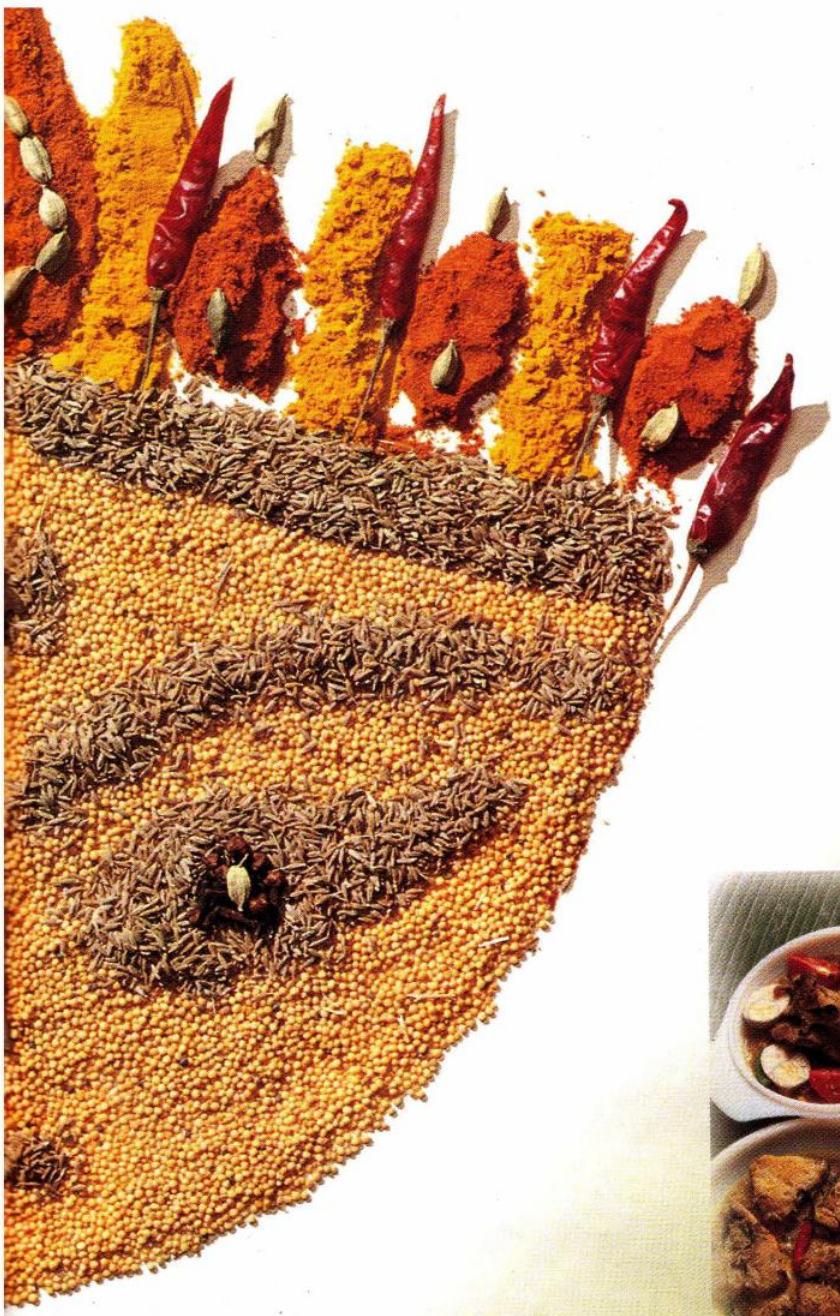

পুজো আর পেটপুজো

ডাটা®

গুঁড়ো মশলা

কুকমী (স্পাইস্) প্রাঃ লিঃ

৩৮, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন ঃ ২৩২-১৭৯৭, ২৩০-০৮৬৩, ২৩৯-৬৫৪৮,
২৩৯-১৬৫৭ ফ্যাক্স ঃ ২৩০-০৭৫৩

ডাটা'র অনন্য সম্ভার

- গুঁড়ো মশলা
- ওয়াশিং পাউডার
- কাপড় কাচার সাবান
- ফ্লোর ক্লিনার
- ব্ল্যাক ফিনাইল
- পাঁপড়
- শেভিং ক্রীম
- ডিটারজেন্ট কেক
- পি.ডি. গুঁড়ো মশলা

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একমাত্র অনুমোদিত ব্রান্ডনির্দ্ধারিত দামে রেশন দোকানে পাওয়া যায়)

BRIGHT

ANANDAMELA 23 SEPTEMBER 1998 REGD. NO. WB/CC/264
TN/MS(C)/734 RS. 15.00